বিশ্বব্রহ্মাণ্ড

আজিজুস সামাদ আজাদ ডন

ভূমিকা

থিওলজি মানেই দ্বিমত থাকবে, আলোচনা-সমালোচনা থাকবে। থিওলজি উপলব্ধি করার বিষয়। ভাষায় প্রকাশ ক'রে সেটাকে স্পষ্ট করা প্রায় অসম্ভব। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড শব্দটির অর্থ মহাজাগতিক। সেই হিসেবে এই লেখায় মহাজাগতিক সৃষ্টি এবং লয় নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা আছে। স্বাভাবিক ভাবেই এই মহাজগতেই যেহেতু আমাদের অবস্থান সুতরাং মানব ভবিতব্য আসবেই। আর মহাজাগতিক দৃষ্টিকোন থেকেই বলি অথবা ধর্মীয় দৃষ্টিকোন থেকেই বলি বা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোন থেকেই বলি, মানুষ হিসেবে আমাদের অবস্থান শুন্য, মানব ভবিতব্যের জন্য শুধু আত্মা নামের শক্তিটিই বিবেচ্য এবং এই বিষয়টিকে এক শব্দে প্রকাশ করা হ'য়ে থাকে "এস্কোটোলজি" দিয়ে।

লেখাটির অনুসিদ্ধান্ত এটা হতে পারে, মানুষের ভৌত অবকাঠামোগত অবস্থান নয়, মানব আত্মার আত্মিক পরিশুদ্ধতা এস্কেটোলজির জন্য প্রয়োজনীয়। আত্মা একটি শক্তি, সুতরাং এর বিনাশ নাই। আত্মার পরিশুদ্ধতা অর্জন সম্ভব শুধুমাত্র নিজস্ব বিশ্বাস থেকে। আমার এস্কেটোলজি ভাবনা প্রথমবারের মত গতি পেয়েছিল আমার এক খুবই ঘনিষ্ঠ হিন্দু ভদ্রলোকের মৃত্যুর সময়। আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। তিনি দুইহাতে ছোট্ট দু'টি গীতা নিয়ে শুয়েছিলেন। বলেছিলেন মারা যাবার পর যেন গীতা দু'টি তার চোখের উপর রাখা হয়। মৃত্যুর সাথে সাথেই আমার সৌভাগ্য হয়েছিল তার বাসায় যাবার। যেয়ে দেখি, ভীষন প্রশান্তি নিয়ে তিনি শুয়ে আছেন, তার দুই চোখে সেই গীতা দুটি।

আত্মা নিরপেক্ষ হ'তে পারে না। আত্মার পরিচালন শক্তির বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে আত্মা একটি পক্ষ নেবে। আমার কাছে মনে হয়েছে, আত্মার পরিশুদ্ধি আসতে পারে শুধুমাত্র নিজের বিশ্বাসের পরিশুদ্ধতার মাধ্যমে, কার পরিশুদ্ধতা গৃহিত হবে কার হবে না, অর্থাৎ, আমাদের ইহজাগতিক কর্মের ফলাফল আমাদের হাতে নয়। আমার নিজের আলো নিজেই পরিশুদ্ধ কিন্তু আমরাই আমাদের কর্মের মধ্য দিয়ে এই আত্মাকে বিভিন্ন ভাবে অপরিশোধিত করে ফেলি।

"স্যাটারডে ক্লাব সিলেটে" লেখাটিতে আমি কি বলতে চেয়েছি সেটা আমার দু'একজন হাতে গোনা যে পাঠক রয়েছেন তাদের বেশীর ভাগকেই বোঝাতে সক্ষম হইনি। সেরকম একজন পাঠক, একদিন বেশ আচমকা বললেন, তার রবীন্দ্রনাথের "পৃথিবী" কবিতাটি ভীষন ভাল লাগে। আমি না বলে পারলাম না যে, "পৃথিবী" কবিতাটিই যদি ভাল লাগে তাহলে "স্যাটারডে ক্লাব সিলেটে" লেখাটি বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে কেন। কারণ, ঐ কবিতারই গদ্য রূপ ধরে নেয়া যায় এই লেখাটিকে। তবে সেই গদ্য আমার মত করে তৈরী। "স্যাটারডে ক্লাব সিলেটে" লেখাটি বেশ দুর্বোদ্ধ হয়ে গিয়েছে শুধুমাত্র সাইন্টিফিক ব্যাখ্যা, বিজ্ঞানের কি ভাবনা সেটা নিয়ে মাথা ঘামানোর কারণে।

কোন একটি লেখায় যদি লেখক অন্য কোন লেখার রেফারেন্স নিয়ে আসে, তাহলে আমি মনে করি ঐ রেফারেন্সের লেখাটিও পড়া উচিৎ, কারণ আর কিছুই নয়, সব লেখকের মনেই একটি বিষয় কাজ করে যে, আমি তো এই কথাগুলো আরেকটি লেখায় বলেইছি, সুতরাং, পুণরাবৃত্তির কোন মানেই হয় না। যেমন, এস্কেটোলজির উপর আমার প্রথম লেখা "গন্তব্য, শেষগন্তব্য ও ভবিতব্য"তে আমি খুব পরিষ্কার

ভাবে বলেছি, এস্কেটোলজি কোন একটি মানুষের নীতি নির্ধারণকারী বিষয় নিয়ে নয়, এস্কেটোলজি মানেই আত্মার ও মানবতার ভবিতব্য বিষয়ক আলোচনা। ভবিতব্য আর গন্তব্য বা শেষগন্তব্যের মাঝে পার্থক্য এখানে আবার দ্বিতীয়বার আলোচনা করবোনা।

এই লেখাটি আমার আরও তিনটি লেখার অংশ। এস্কেটোলজি নিয়ে আমার মোট চারটি লেখা,
১) গন্তব্য, শেষ গন্তব্য ও ভবিতব্য।
২) চিন্তা, চিন্তক এবং
৩) স্যাটারডে ক্লাব।
৪) বিশ্বব্রহ্মাণ্ড।
এই চারটি লেখা দিয়ে "চতুরঙ্গ" নামে একটা বই বের করার ইচ্ছে রইলো।

মানুষ এবং রোবট

“আই রোবট” মুভিটি আমার থিয়েটারে দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল। সাইন্ড সিস্টেম আর থিয়েটারের চাকচিক্যের মাঝে আমি হারিয়ে গিয়েছিলাম বলেই কিনা জানিনা, মুভিটির সব কিছুই ভাল লাগলেও অনেক কিছুই আমার বোধে ধাক্কা দেয়নি। শুধু মনে হয়েছে, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের উত্থানে রোবটেরা একদিন মানব জাতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষনা করে বসলে কি ঘটতে পারে সেই ভবিষ্যৎ ভাবনাই চিত্রনাট্যের মৌলিক উপাদান। পরে ঘরে বসে কয়েকবার মুভিটি দেখার পর মনে হল, নাহ, গল্পকার আরও অনেক কথাই বলে গিয়েছেন। বলে গিয়েছেন মানব সৃষ্টির কথা, বলে গিয়েছেন রোবটের হাজারো উন্নতির পরেও মানুষের সাথে রোবটের পার্থক্যের কথা।

মুভিটির একটি যায়গায় আমাকে বেশ নাড়া দিয়েছে। একটি এক্সিডেন্টে যখন একই সময়ে একজন পূর্ণ বয়স্ক পুরুষ এবং একটি শিশুকে বাঁচাবার প্রশ্ন এসে সামনে দাঁড়ালো, তখন রোবটিক রেশনালিজম বা যৌক্তিক ব্যাখ্যায় রোবটটি সিদ্ধান্ত নিলো, যেহেতু পূর্ণ বয়স্ক মানুষটির বাঁচার সম্ভবনা ৪৫% এবং শিশুটির বাঁচার সম্ভবনা ১১%, সুতরাং, বহু অনুরোধ সত্বেও পুরুষটিকেই বাঁচানো উচিত বলে রবোটটি সিদ্ধান্ত নিলো। আমার মতে এমনকি যদি শিশুটির বাঁচার সম্ভবনা ৪৪%ও হ’ত, তারপরও রোবটটি ৪৫% কেই বাঁচাতো।

এখানেই আমার প্রশ্ন। যদিও ছবির নায়কের সিদ্ধান্ত ছিল বাঁচার সম্ভবনার ভিত্তিতে নয়, মানবিক দৃষ্টিকোন থেকে শিশুটিকেই বাঁচানো উচিৎ ছিল, অর্থাৎ, সেটা মানবিক আবেগীয় সিদ্ধান্ত। তাহলে কি আমরা ধরে নেবো মানুষ সর্বাবস্থায় আবেগীয় সিদ্ধান্ত নেয়, যৌক্তিক সিদ্ধান্ত নয়। অথবা, একই পরিস্থিতিতে প্রতিটি মানুষ কি একই ধরনের সিদ্ধান্ত নেয়? নাহ, নেয় না। পরিবেশ পরিস্থিতি এবং মানুষটির ঐ সময়ের মানসিক অবস্থান, মানুষের বেড়ে ওঠার সার্বিক অবস্থা তার সিদ্ধান্তে প্রভাব ফেলবেই। এখানেই চলে আসে নায়ক আর খলনায়কের ব্যাখ্যা। কোন একটি পরিস্থিতিতে নেয়া এক ব্যক্তির সিদ্ধান্তের সাথে যদি বেশীর ভাগ মানুষের “হ’তে পারতো” সিদ্ধান্তের মিল থাকে তবেই সে নায়ক।

একটি শিশু কি পরিবেশে, কি জেনে, কি বিশ্বাস নিয়ে বড় হয়েছে সেটাই প্রভাব ফেলে সেই শিশুর ভবিষ্যৎ সিদ্ধান্ত সমুহে। তাহলে কি রোবট এবং মানুষের পার্থক্য একটি যায়গাতেই? যৌক্তিকতার কঠোরতার বাইরে, অনুশীলন ও পর্যবেক্ষনের মাধ্যমে, ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে ব্রেইনের শিক্ষণ পদ্ধতির

প্রয়োগই মানুষ আর রোবটকে আলাদা করে দেয়? অবশ্যই এটুকু ঠিক আছে। তবে, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সও আজ যৌক্তিকতার কঠোরতার বাইরে, অনুশীলন ও পর্যবেক্ষনের মাধ্যমে এ.আই দ্বারা সংগঠিত ভুলগুলো থেকে নিজ শিক্ষণ পদ্ধতির প্রয়োগে এতই উন্নত যে, এই বিষয়ে চরম উৎকর্ষতায় পৌঁছানো এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র।

এস্কেটোলজি এবং ধর্ম

বৈশিষ্টগত ভাবে মহাবিশ্বের সবকিছুই একে অপরের সাথে একই সূত্রে গাঁথা। সেই সূত্র খুঁজতে যেয়ে এস্কেটোলজি বিষয়ে আমার জানার আগ্রহ জন্ম নেয়। সমস্যা হল, এস্কেটোলজি বিষয়টি ধর্মীয় বিশ্বাস থেকে গড়ে উঠবার কারণে প্রায় প্রতিটি ধর্মেরই এই বিষয়ে নিজস্ব চিন্তা ভাবনা আছে। কিন্তু আমার ধর্ম বিশ্বাসের সাথে তাল মিলিয়ে গড়ে ওঠা এস্কেটোলজির ওপর লেখা বা বই খুব কম পাওয়া যায়। এমনকি সুফিবাদী বিপ্লবীয় চিন্তা ভাবনার যুগেও এস্কেটোলজি নিয়ে কথা বার্তা খুব কম হয়েছে। যতটুকু চিন্তা ভাবনা হয়েছে সেটা দ্বাদশ শতক পর্যন্ত বুখারা ও পারস্য কেন্দ্রীক। কারণ খুঁজতে যেয়ে আমার মনে হয়েছে, আমাদের ধর্মও ঐ সময়ের পরে এসে মুক্ত চিন্তার গন্ডিকে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছে, জ্ঞান চর্চা ও ধর্ম কে আলাদা করে দিয়েছে। অথচ দু'টো বিষয় একে অপরের পরিপূরক হওয়া উচিৎ বলে আমার মনে হয়েছে। অন্যদিকে এস্কোটোলজি নিয়ে নিজস্ব চিন্তা ভাবনার বাইরে কিছু বুঝতে হলে, এস্কেটোলজিয় ভাবনায় আমার ধর্মীয় বিশ্বাসের কাছাকাছি খ্রিষ্টিয় চিন্তাবিদদের লেখা সাহায্য করতে পারবে কিনা সেটাতে আমার প্রচুর সন্দেহ আছে।

ইসলামী ধর্ম বিশ্বাস নিয়ে এস্কেটোলজি সম্পর্কিত কিছু ভাবনা বিখ্যাত দার্শনিক, বিজ্ঞানী, কবি ওমর খৈয়ামের লেখায় পাওয়া যায়। তবে উনি এই বিষয়ে গভীরে যাননি। তার এক বিখ্যাত এস্কেটোলজিও উক্তি, "এমন এক দরজা যার কোন চাবী খুঁজে পাইনি, কারণ, এমন একটা পর্দা ছিল যার কারণে আমি দেখতে পাইনি"। ওমর খৈয়ামের আমার সবচেয়ে প্রিয় এস্কেটোলজিও উক্তি, "জ্ঞানের সুধা পান কর জানার জন্য, তুমি কোথা থেকে এসেছ, কেন এসেছো, তুমি কোথায় যাচ্ছ এবং কেন যাচ্ছ"।

এস্কেটোলজির আলোচনায় একক সৃষ্টিকর্তা কর্তৃক সৃষ্টির সেরা জীবকে প্রদত্ত জীবন পদ্ধতি পরিচালনা করবার সারতত্ব হিসেবে ধর্মগ্রন্থের স্থান থাকবে, ইংরেজীতে যাকে বলা যায় "USER MANUEL"।

"এস্কেটোলজি"

উৎপত্তি ইতিহাস ঘাটলে দেখা যায়, মাত্র উনিশ শতকের প্রথমার্ধে এস্কেটোলজি শব্দটির ইংরেজিতে ব্যবহার শুরু হয়েছে। শব্দটির ব্যপক প্রচলন হয়েছে বিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকের কাছাকাছি সময়ে। আর একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকেই এর চুড়ান্ত ব্যবহার হয়েছে এবং এখনো চলছে। এত কথা বললাম, শব্দটি আমার প্রজন্মের শব্দ বোঝাবার জন্য। সুতরাং, আমার প্রজন্মের মানুষ শব্দটির ওপর আকর্ষিত হলেও বুখারা বা সুফিবাদী যুগে এই বিষয়ক আলোচনা থাকলেও, নির্দিষ্ট ভাবে এই শব্দ কেন্দ্রিক আলোচনা হবার কারণ নেই।

Eschatology শব্দের উৎপত্তি গ্রীক শব্দ eskhatos যার অর্থ "শেষ" থেকে। এস্কেটোলজি শব্দটির বাংলা পরিভাষায় অন্তত এক শব্দে প্রকাশ যোগ্য কোন শব্দ আমার চোখে পরেনি। আমি শুধু ওমর খৈয়াম বা প্ল্যাটোর মত দার্শনিকদের চিন্তা ভাবনাকে ধারন করে এস্কেটোলজিকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছি। লেখাটি

শেষ হবে না কখনোই, কারণ, জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা এবং জ্ঞানের শেষ সীমান্তের মাঝে ফাঁকটি এতোই বেশি যে, সেই চেষ্টা করলেও "অন্ধের দলের হাতি দর্শন" গল্পের মত অবস্থা দাঁড়াতে পারে; গল্পটি সবার জানা, তারপরও ছোট্ট করে আরেকবার বলি।

একদল অন্ধকে হাতি দেখাতে নিয়ে যাওয়া হল। কোন অন্ধ হাতির পা ধরে অনুভব করলো হাতি মানে একটি থাম্বা, আরেক অন্ধ কান ধরে মনে করলো হাতি মানে বিশাল কুলা, আরেকজন শুর বা আরেকজন শরীরের অন্য কোন অংশ ধরে একেকজন একেক রকম হাতি দেখে আসলো কিন্তু একজনের পক্ষেও হাতির সম্পুর্ন এবং সঠিক বর্ণনা দেয়া সম্ভব হল না। আমার অবস্থাও হয়তো “অন্ধের হাতি দর্শন” এর কাছাকাছি কিছু একটা দাঁড়াবে। তারপরও, জ্ঞানের সাগরে গা ভাসিয়ে জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা এবং জ্ঞানের শেষ সীমান্তের মাঝে ফাঁকটুকু বন্ধ করার চেষ্টা না করে, বিজ্ঞানের বিভিন্ন ইকুয়েশনের জটিলতার বাইরে গিয়ে, একজন শিল্পীর মত নিজের মনের রঙ তুলিতে এস্কেটোলজিকে রাঙিয়ে তোলার কাজে চেষ্টা চলতে অসুবিধা খুঁজে পাইনি।

আমরা কিছু মহাজ্ঞানী দার্শনিকের উক্তি দিয়ে শুরু করি। প্রথমেই প্ল্যাটোর রিপাবলিক গ্রন্থ থেকে একটা উক্তি উল্লেখ করি, “in every man there is an eye of the soul which is far more precious than ten thousand bodily eyes, for by it alone is truth seen.....”। আবার “The Eye in the Triangle” বইটিতে জনাব রিগার্ডি বলেছেন “..only by the reconciliation of opposing forces is the pathway made to true occult knowledge and practical power...”।

এস্কেটোলজিয় ব্যাখ্যার বিশালতায় না যেয়ে ছোট্ট করে বলা যায়, এস্কেটোলজি ধর্মতত্ত্বের সেই বিষয় যা শেষ বিচার, জন্ম, মৃত্যু, আত্মার এবং মানবতার ভবিতব্য নিয়ে আলোচনা করে। এটা আমার নিজস্ব ব্যাখ্যা নয়, এটা অক্সফোর্ড ডিকশনারির খ্রিষ্টিয় ব্যাখ্যা। খ্রিষ্টিয় ব্যাখ্যা বলার কারন ব্যাখ্যার শেষে কোটেশনের মধ্য দিয়ে বলা হয়েছে,
"Christian hope is concerned with eschatology, or science of last things".

আমরা এস্কেটোলজির ব্যাখ্যার সব কিছু বাদ দিয়ে "শেষবিচার" শব্দটিকে নিয়ে পথ চলা শুরু করি, অর্থাৎ, জ্ঞানের সেই শাখা যেখানে শেষ বিচার বিষয়ক আলোচনা করা হয়। যেই মুহুর্তে শেষ বিচার শব্দটি উচ্চারণ করা হল সেই মুহুর্তে স্বীকার করে নেয়া হল,
১) একক, সর্বময়, সর্বোচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন সৃষ্টিকর্তা কে বা একাত্ববাদ কে।
২) জন্ম, মৃত্যু, প্রজনন, জীবন শক্তি।
৩) আত্মার এবং মানবতার ভবিতব্য।

এটা প্রমানীত সত্য যে, প্রতিটি এটম শুন্য দিয়ে গড়া। কারণ, একটি হাইড্রোজেন এটমের ভেতরে ইলেকট্রন প্রোটন এবং নিউট্রন মিলে যায়গা নিচ্ছে মাত্র ০.০০০০০০০০০০০০৪% যায়গা। বাকিটা শুন্য। একই ভাবে মানুষও একই ধরনেরই কিছু এটম কণিকা দিয়ে তৈরী। এখন মানুষকেও যদি এটমে বিভক্ত করা যায় তবে সেই একই ফলাফল, বারোটা শুনের পর ৪ বসাতে হবে, অর্থাৎ, প্রায় শুন্যই। মহাকাশে যদি যাই তাহলেও প্রায় একই উত্তর পাবো। যদিও মহাকাশবিজ্ঞানীরা মহাকাশের এই শুন্যকে আবার ভাগ করেছেন, আন্টিম্যাটার, এন্টিএনার্জি, ডার্ক ম্যাটার ইত্যাদি অপ্রমাণিত শুন্যতার ব্যাখা দিয়ে কিন্তু শুন্য তো শুন্যই।

সবই যদি শুন্য হয় তবে আমরা কে, কেন, কোথায় আছি, কোথায় যাচ্ছি ইত্যাদি প্রশ্ন স্বাভাবিক ভাবেই সবচেয়ে আগে চলে আসবে। চলে আসবে মৃত্যুর আলোচনা, যা কিনা আপাত দৃষ্টির এই ত্রৈমাত্রিক বিশ্বের প্রেক্ষাপটে শুন্য বলে প্রমানিত "দেহ" থেকে জীবন শক্তির বা আত্মার প্রস্থান এবং সর্বোপরি মানব সৃষ্টি তত্ব নিয়েই আলোচনা। আর মানব সৃষ্টি সংক্রান্ত আলোচনা মানেই মানব ইতিহাসের ভবিতব্য নিয়ে আলোচনা।

আরো আসবে কিছু আধি ভৌতিক প্রশ্ন। কেন বাতাসের ছায়া পরে না অথচ মানুষের বা অন্য অনেক বস্তুর (কঠিন, তরল) ছায়া পরে। সবই তো একই ধরনের শুন্য দিয়ে তৈরী, তাহলে আলোর কণিকা "ফোটন" দুই যায়গায় দুই রকম ব্যবহার করবে কেন? কেন আমাদের শরীরের শুন্যতা কোন একটি দেয়ালের শুন্যতাকে ভেদ করে অন্য পাশে যেতে পারে না। কেন কিছু কঠিন বস্তু স্বচ্ছ আবার কিছু কঠিন বস্তু অস্বচ্ছ। এখানেই চলে আসে

<u>ব্রেইনের খেলা</u>

মানুষের ব্রেইনের মৌলিকত্ব হল তার আবেগীয় অংশ। আমাদের ব্রেইন সকল তথ্য প্রসেসিং কেন্দ্র, আর ব্রেইন তথ্য গুলো সংগ্রহ করে আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয়, তথা, দৃশ্য, শ্রব্য, স্পর্শ, ঘ্রাণ, স্বাদ ব্যবহার করে। শুধুমাত্র একটি উদাহরণ দিয়েই বোঝা যায় যে, ব্রেইনের লীলাখেলা বোঝা দায়। যেমন, আমাদের চোখ যা দেখছে সেটাকে উল্টিয়ে দিয়ে আমাদের ব্রেইন আমাদেরকে বুঝিয়ে দিচ্ছে, তুমি যা দেখছো সেটা সঠিক নয় বরং আমি যেভাবে বলছি সেটাই সঠিক। একই ভাবে কোন বস্তুর স্বাদ, আকার কি কিংবা শরীরের কোন অংশে আমরা কতক্ষণ যাবৎ (সময়) কতটা ব্যাথা অনুভব করছি ইত্যাদি যাবতীয় সব বিষয়েই ব্রেইন আমাদের সর্বোচ্চ সিদ্ধান্ত দিয়ে দিচ্ছে, আর আমরাও মেনে নিচ্ছি। শেখানোর এই পদ্ধতি কিন্তু শুরু হয় জন্মের পর থেকেই। সেটা বোঝার জন্য একটি শিশুর বেড়ে ওঠা দেখাই যথেষ্ঠ।

ছোট্ট দু'টি উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। প্রায় আঠারো মাস বয়স পর্যন্ত একটি শিশু বুঝতেই পারে না লুকোচুরি খেলা। শিশুটির ব্রেইন তখনো শিশুটিকে শেখানো শুরুই করেনি। যে কারণে এই খেলায় শিশু আশ্চর্য হয়ে খিলখিল করে হেসে ওঠে, ভাবে, আরে এই ছিল এই নেই, ম্যাজিক!! আবার একটা বল তার দিকে ছুড়ে দিলে সে সেটা ধরতে পারবে না। কারণ, বল ধরা একটা বিশাল অংকের কাজ এবং সাথে যুক্ত হয় প্রবাবিলিটির থিয়োরী, অনেক জটিল বিষয়, চর্চার বিষয়। বহু চর্চার পরে একসময় একটি শিশুকে মুহুর্তের মাঝেই ব্রেইনের প্রসেস করা বহু তথ্যের সম্মিলনের শেষ ফলাফল হিসেবে তাকে শিখিয়ে দিচ্ছে কোন সময়, কি ভাব্ কোথায় হাত দিলে বলটি ধরা সম্ভব হ'তে পারে।

ব্রেইনের কার্যক্রমকে আলাদা করে প্রাধান্য দেয়ার মানে এই নয় যে, শরীরের অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কোন নিজস্ব পরিচালন ক্ষমতা এবং কার্যক্রম নেই, সবই ব্রেইন করে দিচ্ছে। মোটেই তা নয়। আমরা আগেই বলে এসেছি যে, বস্তুগত হিসেব অনুযায়ী মানুষ যেমন শুন্য, তেমনি এই মহাবিশ্বও শুন্যই। সেই হিসেবে প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গও শুন্যই। তারপরও, যদি ব্রেইনের আলাদা ভাবে নিজস্ব পরিচালন শক্তি থাকতে পারে এবং অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে পরিচালিত করবার শক্তি থাকতে পারে, তাহলে অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গেরও অন্তত কিছুটা হলেও নিজস্ব পরিচালন সিদ্ধান্ত শক্তি আছে, যে শক্তি তারা তৈরী করেছে প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের প্রতিটি কোষের সৃষ্ট কম্পনের মাধ্যমে। সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কম্পনাঙ্ককে এক সুরে গেঁথে আমাদের শরীর একটি ঐক্য তৈরী করে।

আমাদের ব্রেইন ডান এবং বাম দুই ভাগে বিভক্ত। বাম ভাগ কাজ করে যুক্তি দিয়ে ডান ভাগ কাজ করে আবেগ দিয়ে। ব্রেইনের যুক্তি দিয়ে বিচার করার এই সত্তাকে আমরা আলোচনার সুবিধার্থে ধরে নেই "যুক্তি" সত্তা, আরেকটি সত্বার আমরা নাম দেই “আবেগ" সত্বা। এই সত্বা দুটোর আবার বিভিন্ন ডাইমেনশন আছে। আলোচনার সুবিধার্থে "যুক্তি" সত্বা অংশের বিভিন্ন ডাইমেনশন নিয়ে কথা বলার সময় "মাত্রা" শব্দটি এবং "আবেগ" সত্বার বিভিন্ন ডাইমেনশন নিয়ে কথা বলার সময় "স্তর" শব্দটি আমরা ব্যবহার করবো।

ব্রেইনকে আরও অনেক ভাগে ভাগ করা যায়, বিশেষ ক'রে চোখের সকল বৈশিষ্ট নিয়ে দৃষ্টির আড়ালে থাকা ব্রেইনের পাইনিয়াল গ্ল্যান্ড বা তৃতীয় নয়ন সবচেয়ে বেশী সমস্যা তৈরী করে দিয়েছে। এটা কি যুক্তির অংশে পরবে, না আবেগের অংশে পরবে? জীবনী শক্তির ভর কেন্দ্র গুলোর মাঝে এর কোন ভূমিকা আছে কিনা ইত্যাদি।

আমরা যখন কোন সিদ্ধান্ত নিতে যাই তখন আমার মাঝের এই দুই "যৌক্তিক" ও "আবেগীয়" সত্বা সবসময় দুই মেরুতে অবস্থান করে, অর্থাৎ, যদি যুক্তি সত্বা “হ্যা” বলে তবে আবেগ সত্বা “না” বলবেই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোন এক অজ্ঞাত কারণে দুই সত্বা নিজেদের মধ্যে আপোষ করে এবং একটি সিদ্ধান্ত নেয়। এখন সমস্যা দাঁড়ালো, ব্রেইনের দুইটি সত্বা নিজেদের মধ্যে আপোষ রফা ক'রে আমাকে শেখাচ্ছে, বলে দিচ্ছে কি, কে, কেন, ভাল, মন্দ ইত্যাদি বিষয়গুলো, তাহলে তো অবশ্যই আরেকটি সত্তা আমার মাঝে বিরাজমান, যাকে কষ্ট করে ব্রেইনের দুই সত্তা মিলে বোঝাচ্ছে।

এই যে ব্রেইন যাকে বোঝাচ্ছে এটার নামকরণ করা যাক “চৈতন্য”। বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টায় এই ধারনায় পৌছানো গিয়েছে যে, এই “চৈতন্য”র অবস্থান ব্রেইনের কার্যকলাপের বাইরে। বিষয়টিকে আরেকটু ব্যাখ্যা করা যায় কিনা দেখা যাক। ধরা যাক টেলিভিশনের কথা। টেলিভিশন বিভিন্ন চ্যানেলের সিগনালকে নিয়ে এসে আমাদের সামনে হাজির করছে। এখন ধরা যাক, টেলিভিশন সেটটি নষ্ট হ’য়ে যাবার কারণে কোন সিগনালকে সে আমাদের সামনে আনতে পারছে না, তাহলে কি আমরা ধরে নেবো টেলিভিশন সিগনাল গুলো আর নেই। নাহ, আছে। টেলিভিশন সেটটিকে এখানে ব্রেইন এবং টেলিভিশন সিগনাল এখানে একটা “আমি”র জন্য তার “চৈতন্য” হিসেবে ধরে নেয়া যায়।

<u>যৌক্তিক “মাত্রা”</u>

বিষয় বস্তুর আরও গভীরে যাবার আগে বিষয়ের আপাত বাইরের কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করা যাক। ব্রেইনের যৌক্তিক অংশের "মাত্রা" আমাদের এই আপাত দৃষ্টির ত্রৈমাত্রিক বিশ্বের পরিমাপক এবং সাভাবিক ভাবেই এই মাত্রা স্থান সূচক নিয়ে কাজ করে। যেমন “শুন্য” মাত্রা একটি স্থান সূচক যার কোন দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উষ্চতা নেই। যখন এই ধরনের দু’টি শুন্য মাত্রা একে অপরের সাথে যুক্ত হ'য়ে একটি রেখা তৈরী করে যার শুধু দৈর্ঘ্যই থাকবে কিন্তু কোন প্রস্থ বা উষ্চতা থাকবে না তখন সেটাকে বলা হচ্ছে প্রথম মাত্রা। এই প্রথম মাত্রা দিয়ে আমি যে ভাবেই চলি না কেন, আমার অবস্থান রেখার বাইরে নয়।

দ্বিতীয় মাত্রা স্বাভাবিক ভাবেই পরের মাত্রা, যখন প্রথম মাত্রার দুটি রেখাকে আরও দুটি রেখা দিয়ে যুক্ত করে একটি ক্ষেত্র তৈরী হবে, যার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ আছে কিন্তু উচ্চতা নেই। এবার কিছুটা ফ্লেক্সিবিলিটি বাড়লো। এই মাত্রায় এসে আমি কিছুটা নয় ছয় করতে পারবো, অন্তত ডানে বামে যেতে পারবো।

যখন দুই বা ততধিক দ্বিমাত্রিক ক্ষেত্র এক হয়ে উচ্চতা তৈরী করবে, তখন তৈরী হবে তৃতীয় মাত্রা। এবার আমরা ডান-বামের সাথে সাথে উপরে নীচেও যেতে পারবো। প্রাথমিক ভাবে মনে হবে, আমরা ত্রিমাত্রিক জগতের বাসিন্দা, যে কারনে আমাদের ব্রেইন সব কিছুই ব্যাখ্যা করছে ত্রিমাত্রিক দর্শন দিয়ে। আসলে কি এটা সঠিক সিদ্ধান্ত? আমরা কি আসলেই ত্রিমাত্রিক বিশ্বে বসবাস করছি?

<u>এস্কেটোলজি-সময়-পর্যবেক্ষক</u>

আইনস্টাইন বিশ শতকের প্রায় শুরুতেই দুটি তত্ব ঝেড়ে সমস্ত পৃথিবী আলোড়িত করে তুলেছিলেন, থিওরী অব জেনারেল রিলেটিভিটি এবং থিওরি অব স্পেশাল রিলেটিভিটি। জেনারেল রিলেটিভিটিতে উনি তৃতীয় মাত্রার সাথে আরেকটি ডাইমেনশন তত্ব, অর্থাৎ, চতুর্থ মাত্রা এনে হাজির করেছেন, যেখানে "সময়" কে আরেকটি মাত্রা বা ডাইমেনশন হিসেবে হাজির করা হয়েছে। এই “সময়” কে ব্যাখ্যা করতে যেয়ে দেখা যাচ্ছে, "সময়" সামনেই শুধু যায় না, সময় পেছন দিকেও যেতে পারে। কিন্তু এই "সময়" মাত্রটিকে তিনি নির্ভরশীল করে ফেলেছেন মহাশুন্যে “আলো”র গতির কাছে। সেই গতি আবার আপক্ষিক, অর্থাৎ, অন্য কোন একটি বস্তুর গতির সাথে তুলনামুলক অবস্থান। অর্থাৎ, মহাশুন্যে পৃথিবীর গতির তুলনায় কোন বস্তুর গতি যত বাড়বে, সেই বস্তুর "সময়"এর গতি পৃথিবীর তুলনায় ততই কমতে থাকবে এবং যেই মুহূর্তে বস্তুটি আলোর গতির বেশী গতিতে চলা শুরু করবে, সেই মুহূর্ত থেকে ঘড়ির কাটা উল্টো দিকে চলা শুরু করবে, অর্থাৎ, অতীত মুখী হয়ে।

তবে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় ওয়ার্ম হোল, লুপ হোল, গ্র্যাভিটেশনাল টাইম বেন্ডিং ইত্যাদি আমার বোধের বাইরে থাকার কারণে, এই পর্যায়ে এসে কেন জানি আইনস্টাইনকে সঙ্গ দিতে পারে না, অর্থাৎ, পৃথিবীর তুলনায় যদি ঐ বস্তুতে অবস্থিত ঘড়ির কাটা পেছন দিকে যেতে থাকে তবে তো পৃথিবীর ভবিষ্যতের দিকেই আমরা এগিয়ে যেতে থাকবো, অতীতের দিকে নয়। আমার বোধ আমাকে বলে, যেভাবে স্রষ্টার সৃষ্টির আগে কি ছিল সেখানে যেমন যাওয়া সম্ভব নয়, ঠিক সে ভাবেই ভবিষ্যত বিজ্ঞান যত দূরেই যাক না কেন, “সময়” মাত্রাকে জয় করার জন্য যে যন্ত্রই আবিষ্কার করা হোক না কেন, সেই যন্ত্র আবিষ্কার মুহূর্তের অতীতে তারা কখনোই যেতে পারবেন না। যাইহোক, এই তত্ব অনুযায়ী সময়ের এই আপেক্ষিকতা তো নির্ভরশীল মহাশুন্যে পৃথিবীর তুলনায় আলোর গতির উপর। তাহলে কি পৃথিবীর “সময়” এবং অন্য কোন “সময়” এর ব্যাখ্যা কি দুই রকম হওয়া সম্ভব।

আমরা আমাদের মাত্রা নামের সমস্যার কাছে ফিরে যাই আবার। আমার কাছে মনে হয়েছে, আগের তিনটি স্থান সূচক “মাত্রা” একে অপরের উপর নির্ভরশীল, অর্থাৎ, শুন্য “মাত্রা” এর সাথে প্রথম “মাত্রা” এবং একই ভাবে প্রতিটি মাত্রা একে অপরের সাথে জড়িয়ে আছে স্থান সূচকের মধ্য দিয়েই। এই স্থান সূচকের সাথে “সময়” নামক সূচককে লাগাবার জন্য আলোর গতিকে ধরা হয়েছে একটি মাধ্যম, যে মাধ্যম কিনা আবার আপেক্ষিক, অর্থাৎ, গতি সব সময় নির্ভরশীল আরেকটি স্থানিকের গতির তুলনা মূলক বিচারের উপর। তাহলে প্রথম তিনটি স্থানিক “মাত্রা” তৈরির মত, তৃতীয় স্থানিক “মাত্রা” এর সাথে জোড়া লাগাবার জন্য কোন স্থানিক মাত্রা "সময়" নামক চতুর্থ মাত্রায় অনুপস্থিত কেন?

"কোয়ান্টাম মেকানিক্স" বা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কণা সমুহের বিজ্ঞান নামের আরেক থিওরিতে এসে পদার্থের ব্যবহার বদলে যায়। “সময়” এর ব্যাখ্যায় ব্যবহৃত আলোর ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কণা “ফোটনকে যদি দুটি ছিদ্র পথের অপশন্স দেয়া যায় তবে সে কোন পথে যাবে সেটার জন্য কাউকে না কাউকে দেখতে হয়। যদি কেউ না দেখে তবে তারা একরকম ব্যবহার করে, আর যদি দেখে তবে তারা অন্য রকম ব্যবহার করে। তাহলে কি আমরা বলতে পারি, আমাদের এই মহাবিশ্বে "সময়" কোন একজনের পর্যবেক্ষনের প্রেক্ষাপটে ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, আবার তার ইচ্ছের প্রেক্ষাপটেই "সময়" তার দিক পরিবর্তন করে। “সময়” এখানে বহুমুখী আচরন করতেই পারে কিন্তু একটি স্থানিক মাত্রা কিছুতেই “সময়”কে ছুঁতে পারে না, কারণ, “সময়” এর হিসেব অনুযায়ী অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যতকাল সব একই সময়ে উপস্থিত একটি টাইম-টানেলের আলাদা আলাদা স্থানিক অংশে অবস্থিত এবং এই কারনেই “সময়” আগে পিছে যেতে পারে।

আমাদের এই তথাকথিত ত্রিমাত্রিক মহাবিশ্বে, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রমান করা সম্ভব থিয়োরি অব জেনারেল রিলেটিভিটি কে। মানে, “সময়” গতির সাথে সাথে পরিবর্তিত হয় সেটা প্রমান করা সম্ভব। যে কারণে, গতির গাড়িতে চড়ে, সময়ের বাধা পারি দিয়ে, অতীত বা ভবিষ্যতকে টিভি স্ক্রীনে মুভি দেখে আসার মত ভাবনাটি আজগুবী কোন ভাবনা হয়তো নয় কিন্তু টাইম মেশিনে চড়ে অতীত, বর্তমান ইত্যাদিতে যেয়ে, সেখানে কোন পরিবর্তন এনে, বর্তমানকালের ঘটনাপ্রবাহ পরিবর্তন করার চেষ্টা অবুঝের মত কথা। কারণ, বলাই হচ্ছে যে, বর্তমান, অতীত, ভবিষ্যৎ সবই একই টাইম টানেলে আবদ্ধ। যেখানে আমাদের বোধগম্য "যৌক্তিক" মাত্রা ও প্রায় বোধগম্য "আবেগীয়" স্তরের তিনটি ধাপই এখনো অতিক্রম করা যায়নি, সেখানে মৃত্যু ব্যতীত "সময়"এর মাত্রা ও স্তর অতিক্রম করে, এই টাইম-টানেলের বিভিন্ন স্থানিক অংশে যেয়ে সেই অংশে পরিবর্তন আনবার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখার সম্ভবনা অনতিক্রমণীয়।

আবার কোয়ান্টাম মেকানিক্সও প্রমানিত সত্য। তার মানে দাঁড়াচ্ছে, একই সময়ে কোন একেকজন পর্যবেক্ষকের প্রেক্ষাপটে তৈরী হয়ে চলেছে "হ্যা" এবং "না" এর দু'টো সম্ভবনাই। অর্থাৎ, চরম সত্য বলে কোন শব্দ নেই। সত্য শুধু সেই অংশটুকুই যখন কোন সময়ে কোন একটি অংশ কেউ একজন দেখছেন। এটুকু পর্যন্ত ঠিকই ছিল কিন্তু যেই মুহূর্তে বিজ্ঞান দুই থিওরিকে একই বাক্সে ঢেলে প্রমান করার চেষ্টা করেছে, সেই মুহূর্তে দুই থিয়োরির সেই প্রমান সমুহ অচল হয়ে গিয়েছে।

আবেগীয় ডাইমেনশন "স্তর"

ব্রেইনের আরেক অংশ, "আবেগীয়" স্তর দিয়ে "সময়" নামক চতুর্থ স্তর কে ব্যাখ্যা করা যায় কিনা দেখা যাক।
সেদিন কোথায় যেন এক দারুন কাব্য পড়লাম,
"মিথ্যা এখন দাপিয়ে বেড়াচ্ছে আকাশ বাতাস, সত্যকে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। যদি খুঁজে পাওয়াও যায় তবে সেটাকে পাওয়া যাবে কালো বাজারে এবং সেই সত্যটুকুর জন্য চড়া মূল্য দিতে হবে"।

ভাল কথা। কিন্তু সত্য আর মিথ্যাকে নিয়েই যদি এতো দ্বন্দ এবং ধন্দ, তাহলে
হ্যা - না
ভাল - মন্দ
সাদা - কালো

আনন্দ – দুঃখ
এসবের দ্বিধা দ্বন্দ্ব কাটাবো আমরা কেমন করে। কাটাতে পারবোনা। কারণ, এগুলো সবই নির্ভর করে কোন যায়গায় দাঁড়িয়ে আমি বিষয়টি দেখছি। যেমন, মানুষ খুন করা নিষিদ্ধ কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে উভয় পক্ষই মানুষ খুন করছে কেন? এক্ষেত্রে কোন একটা পক্ষ তো অবশ্যই ভুল কারণে মানুষ খুন করছে। অথবা আরও মীমাংসিত বিষয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কাছে যাই। আমরা কি জানি জার্মানীর নাৎসিরা যুদ্ধে জয়ী হলে কি দাঁড়াতো। আমরা দেখছি বর্তমান জয়ী পক্ষের পৃথিবী। জার্মান নাৎসিরা নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমান করবার জন্য যুদ্ধ করেছিল বলে আমরা জানি কিন্তু তারমানে তো এই দাঁড়ালো যে, যুদ্ধের আগেই একটি প্রমানিত শ্রেষ্ঠ পক্ষ ছিল। তাহলে সত্য কোনটা আর মিথ্যা কোনটা? আমরা বরং আশ্রয় নেই ওমর খৈয়ামের একটি উক্তির কাছে, “সত্য ও মিথ্যার মধ্যবর্তী দূরত্ব হলো এক চুল পরিমান”।

আমরা চলে যাই আরও নৈর্ব্যক্তিক বিষয়ের কাছে। ইউনিভার্সাল ট্রুথ, সূর্য পুর্ব দিকে ওঠে পশ্চিমে অস্ত যায় কথাটি কি আসলেই সম্পুর্ন সত্য। আমরা তো আগেই দেখেছি ব্রেইন কি ভাবে আমাদের উলটো বিষয় সোজা করে দেখায়। মহাবিশ্বকে দেখার সময়ও কি সে একই নিয়ম মানে?

আমরা এবার চলে যাই "আবেগ" নামক ব্রেইনের ডান দিকের "স্তর" বা ডাইমেনশনের ব্যাখ্যার কাছে। মানুষের “আবেগ" এর প্রথম স্তর গঠিত হয়েছে যৌনতা তথা ভালবাসা দিয়ে। ভালবাসার অন্য প্রান্তে দাঁড়ানো পশু শক্তি, পশু শক্তি মানেই ভয়। আবেগের এই প্রথম “স্তর” এবং স্থানিক প্রথম “মাত্রা” এর মত ভয় আর ভালবাসার মিলন মেলায় বাকি সবই শুন্য।

দ্বিতীয় স্তর "আমিত্ব" বা "ইগো"। স্বাভাবিক ভাবেই "আমিত্ব" এর বিপরীত মেরুতে অবস্থান করছে "সম্পর্ক", অর্থাৎ, এক আমি আরেক আমিকে কি ভাবে সম্পর্কিত করবে সেটাই হবে দ্বিতীয় স্তরের দ্বিতীয় মিলন কেন্দ্র। দ্বিতীয় স্তরে এসে মনে হচ্ছে কিছু হাত পা খুলে কাজ করার সুযোগ তৈরী হয়েছে, কারণ, অন্তত এক আমি ও আরেক আমির সম্পর্ক নির্ণয়ের কাজ জড়িত হল প্রেম ও ভয়ের মাধ্যমে।

তৃতীয় স্তরে আছে "কল্পনা"। আমাদের বসবাস এখন এই স্তরেই। কল্পনার বিপরীত মেরুতে অবস্থান করছে "প্রশ্ন"। এই তৃতীয় স্তরের কারনেই বিজ্ঞানের জন্ম, যে কারনে মানুষ এগিয়ে চলেছে। এবার এই স্তরে এসে সম্ভাবনার বিশাল দুয়ার খুলে গেল আমাদের সামনে। আমাদের কল্পনার জগত, স্বপ্নের জগত, অলীক ভাবে তৈরী হয় কিনা, তৃতীয় স্তর বোঝার জন্য আমি একটা স্বপ্নের কথা বলি।

স্বপ্ন দেখলাম আমার মোবাইল হারানো গিয়েছে। মোবাইলটা হারাবার আগে খেয়াল করিনি আমি কোথায় আছি। হারাবার পর আমার মনে প্রশ্ন জাগলো আমি কোথায় আছি। দেখলাম আমি চট্টগ্রামে আছি। অথচ আমার পরিচিত চট্টগ্রামের কোন যায়গার সাথে আশেপাশের দৃশ্যাবলীর কোন মিল নেই। ঠিক আছে, এর পরের প্রশ্ন জাগলো, এতো যায়গা থাকতে চট্টগ্রাম কেন, কারন ওখানে একটি দাওয়াত আছে। পৃথিবীতে এতো পরিচিত মানুষ থাকা সত্বেও চট্টগ্রামের দাওয়াতে এসে পরিচিত চেহারা নেই কেন, নাহ আছে, ঐ তো ওই যে একজন বসে আছে। যাই তার সাথে গল্প করি। স্বপ্ন বা কল্পনা যাই বলি, এগিয়ে চলেছে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে।

এই স্বপ্ন "আমি" এর প্রেক্ষাপটে "আমি"র প্রশ্ন, "আমি"র ভয়, "আমি"র প্রেম থেকে উৎসরিত আমিত্ব দিয়া গড়া। স্বপ্নটা এখনও চলছে, কতক্ষণ চলবে কেউ জানেনা। এবং প্রশ্ন যেগুলো মনের মাঝে জাগছে তার উত্তরও "আমি" পেয়ে যাচ্ছে পর মুহুর্মুহ ঘটে যাওয়া স্বপ্নের ঘটনাবলির মাঝে। বৈজ্ঞানিক ভাবে

এটাও প্রমাণিত যে, আমরা স্বপ্ন দেখি মাত্র তিন/চার সেকেন্ডের জন্য। অথচ গল্প তৈরী হয়ে যাচ্ছে ঘন্টা খানেকের বা কোন কোন সময় আরও অনেক বেশী। তাহলে এই কল্পনার জগতে এসেও "সময়" হামলা করলো। হ্যা করেছে, কারন "যুক্তি"র মাত্রা গুলো প্রতি মুহূর্তে "আমি"র স্বপ্নকে পরিচালিত করছে, "আমি"র স্বপ্নকে "আমি"র কাছেই যৌক্তিক করে তুলতে চাইছে। বলতে চাইছে কোথায়, কতটুকু, কত সময়ের জন্য "আমি" দুঃখ, কষ্ট, সুখ, বেদনা অনুভব করছে।

"যুক্তি" এর ডাইমেনশন বা “মাত্রা” গঠনের সময় যেমন আমরা দেখেছিলাম এক স্তর আরেক স্তরের সাথে যুক্ত, আবেগেরও এক “স্তর” আরেক স্তরের সাথে একে অপরের সাথে যুক্ত আছে। আর সেই যুক্তাবস্থাতেই আমরা খুঁজে পাই হ্য-না, সত্য-মিথ্যা, ভাল-মন্দ, সাদা-কালোর মত চুল পরিমান পার্থক্য সম্বলিত বিপরীতার্থক শব্দগুলোকে।

তাহলে কি "যুক্তি" এর চতুর্থ মাত্রার "সময়" আর আবেগীয় চতুর্থ মাত্রার "সময়"কে এক সূত্রে বাঁধলে আমরা সেই যায়গায় পৌঁছাবো যেখানে দাঁড়িয়ে আমরা বলতে পারবো, আমাদের এই তথাকথিত ত্রিমাত্রিক বিশ্বে কর্ম শেষ। সিদ্ধান্ত এখনই নয়। আমরা এগিয়ে যেতে থাকি।

<u>জন্ম-মৃত্যু, প্রজনন</u>

জন্মের আদী মুহূর্ত এবং জন্মের পরও হয়তো মধুরেণু-সম্পায়েত কিন্তু জন্ম মুহূর্তটা সব সময়ই যন্ত্রনাময়। মানব সৃষ্টির যন্ত্রনা হয়তো আমাদের বোধগম্য কিন্তু মহাবিশ্ব সৃষ্টির যন্ত্রনা আমাদের উপলব্ধিতে আনা কি সম্ভব? যদি সম্ভব হয়ও, তাহলেও জন্মের যন্ত্রনা তো মৃত্যু যন্ত্রনার সমপর্যায়েরই হওয়া বাঞ্ছনীয়। জন্ম-মৃত্যু নিয়ে আলোচনা আমাদের উদ্দ্যেশ্য না হলেও আমাদের আলোচনা যেহেতু সৃষ্টির ভবিতব্য নিয়েই, অতএব, জন্ম-মৃত্যু নিয়ে কিছু আলোচনা আসবেই।

জন্ম ও মৃত্যু একই বিষয়। জন্মকে জানলেই যেমন মৃত্যুকে সংজ্ঞায়িত করা যাবে তেমনি মৃত্যুকে জানলেও জন্মকে সংজ্ঞায়িত করা যাবে। আমরা কোথা থেকে এসেছি জানতে পারলে আমরা সহজেই বুঝতে পারবো কোথায় চলেছি। যেহেতু আমাদের পক্ষে মৃত্যুর কাছে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না, সে কারনে জন্ম নিয়েই ভাবনার ডালি সাজিয়ে বসা ভাল।

জন্মকে ব্যাখ্যা করার সবচেয়ে সহজ তত্বের প্রবক্তা ফ্রয়েডের তত্ব কে সরলীকরণ করে উপস্থাপন করলে দাঁড়াবে, আমাদের জন্মটাই এক অসম্ভব বিষয়। কারণ, লক্ষ কোটি শুক্রানুর মাঝে একটি শুক্রানূর ঐ মুহূর্তের ডিম্বানুর সাথে মিলনের ফলে যে জিন ও ডিএনএ-র ধারা তৈরী হয়ে নতুন “আমি” তৈরী হচ্ছে, সেই ধারার সম্ভবনা লক্ষ কোটি ভাগের এক ভাগ। এখন যদি এই বিষয়টিকে পিতা-মাতা, দাদা-দাদীর সাথে সংযুক্ত করি, তাহলে থিয়োরি অব প্রবাবিলিটির সূত্র অনুযায়ী পৃথিবীতে উপস্থিত আমাদের এই বর্তমান “আমি” সত্বার অস্তিত্বের সম্ভবনা শুন্য। আর এর সাথে যদি বিজ্ঞান দ্বারা প্রমানিত পরমানু তত্ব প্রয়োগ করি, অর্থাৎ, সকল পরমানুই দশমিকের পর বারোটা শুন্যের পর চার এর অস্তিত্বের সমান, তাহলে তো ভৌত জগতে আমাদের কোন অস্তিত্বই নাই। সবই শুন্য।

এই যে পরমানুর কথা বলছি, সেটা কিন্তু জড় পদার্থের জন্যও যে ফলাফল, জীবন আছে এমন কিছুর জন্য সেই একই ফলাফল, অর্থাৎ, শুন্য। তাহলে জীবন, জন্ম কি? এই যদি হয় অবস্থা, তাহলে আমাদের মত অস্তিত্ব শুন্য একটা অস্তিত্বের পক্ষে কিভাবে সেই অস্তিত্বের জন্ম, মৃত্যু, জীবনশক্তি নিয়ে

ভেবে কোথায় যেয়েই বা পৌঁছাতে পারবে। হয়তো শুন্যেই পৌঁছাবে কিন্ত ভাবতে দোষ কি। ভাল কিছু না হোক মন্দ কিছু হলেও তো হতে পারে, তাহলে অন্তত ভাল-মন্দের পার্থক্যটা বুঝে ওঠা সহজ হয়ে যাবে।

এখানে এসে আমাদের একটু থামা প্রয়োজন। শুন্যের ব্যাখ্যা কি। চারের আগে তিন ছিল, তিনের আগে দুই, দুইয়ের আগে এক এবং একের আগে শুন্য কিন্ত শুন্যের আগে কি ছিল? কিছুই না। এই কিছুই না কে বোঝাতে আমরা কিন্ত একটা স্থানিক মাত্রা ব্যবহার করেছি, অর্থাৎ, দৈর্ঘ-প্রস্থ-উষ্চতা বিহীন একটি মাত্রা। তারমানে দাঁড়ালো, শুন্যেরও একটা অবস্থান আছে। ঠিক একই ভাবে অসীম বলতে আমরা কি বুঝে থাকি? সীমাহীন কিন্ত কতটুকু সীমাহীন? আমাদের ধারনায় নেই।

তাহলে বিজ্ঞান এই শুন্য এবং অসীম দু'টি বিষয়কেই স্বীকার করছে কিন্ত ব্যাখ্যা দিতে পারছে না। আমাদের ধর্ম এখানে কি বলে? সর্বশক্তিমান শুন্য থেকে সৃষ্টি করেছেন এই মহাবিশ্ব। তারসাথে রয়েছে সপ্ত আসমানের কথা। আরবী ভাষায় সাত, সত্তর শব্দগুলোকে "বহু" বোঝাতে ব্যবহার করা হ'য়ে থাকে। সুতরাং, আমরা ধরেই নিতে পারি, শুন্য থেকে সৃষ্ট আমাদের এই মহাজাগতিক বিশ্ব তৈরী করবার সময় অসীম সংখ্যার মহাবিশ্ব তৈরী হয়েছে। আরও যে কথা আমার ধর্মগ্রন্থে বলা আছে, আমরা এই মহাবিশ্বের বাসিন্দারা কখনোই মহান এককের ছাড়পত্র ছাড়া আরেক মহাবিশ্বের সাথে যোগাযোগ করতে বা যেতে পারবো না।

ছাড়পত্র?? এটা হতে পারে সেই জ্ঞানের কথা বলা হয়েছে, যে জ্ঞান অসীম বা শুন্যকে ছুঁ'তে পারে অথবা আমাদের এই মহাবিশ্ব এমন কিছু আইন দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে যে আইনে আমরা আমাদের এই মহাবিশ্বের বাইরে যেতে পারবো না।

মহাকাশ বিজ্ঞানীদের একটি বিস্ময়ের আমি কোন কারণ খুঁজে পাই না। আমাদের বর্তমান প্রযুক্তি ব্যবহার করে মহাকাশ বিজ্ঞানীরা ১৩.৭ আলোকবর্ষ দূরের মহাকাশ অবলোকন করতে পারেন। মানুষের বর্তমান প্রযুক্তির শেষ সীমান্তের দিকে চোখ রেখে তারা বিস্মিত হন এই ভেবে যে, তারা যত দূরে যান ততই তারা দেখেন মহাবিশ্বের শেষপ্রান্ত আরো দ্রুত গতিতে ছুটে চলেছে এবং ছড়িয়ে পরছে। তারা ভেবে কোন কূল-কিনারা করে উঠতে পারছেন না যে, গতির সূত্র অনুযায়ী যেখানে নক্ষত্র গুলোর গতি কমে যাবার কথা, সেখানে বাড়ছে কেন? এইখানে এসে তারা পিচকারী তত্ব থেকে শুরু করে বহু তত্বই প্রয়োগ করেছেন কিন্ত একটি বিষয় এড়িয়ে যাচ্ছেন যে, তারা যত দূরের দিকে তাকাচ্ছেন ততই তারা শুন্য থেকে সৃষ্ট এই মহাজাগতিক বিশ্বের জন্ম লগ্নের দিকে এগিয়ে চলেছেন, অর্থাৎ, শুন্যের দিকে এগিয়ে চলেছেন। মহাবিশ্ব জন্মের প্রাথমিক স্তরে অবশ্যই সব কিছুই দ্রুত ছিটকে পরা শুরু করেছিল।

প্রশ্ন থেকে যায়, আমাদের প্রযুক্তি কি সেই পর্যায়ে যাবে যে যায়গা থেকে আমরা "কুন" শব্দটির ব্যাখ্যা খুঁজে পাবো বা সেই আসীম শুন্যতার দেখা পাবো যেখান থেকে আমরা মহাবিশ্বের জন্মের যন্ত্রনাময় চিৎকার শুনতে পাবো। আমার ধর্মমতে আমি বলবো, না পারবো না। যাইহোক, আমার কাছে যেটা সমস্যা মনে হয়েছে, আমরা আমাদের বর্তমান প্রযুক্তির সাহায্যে মহাকাশের যেদিকেই তাকাই না কেন, আমরা শুধুই মহাজাগতিক সৃষ্টির প্রারাম্ভিক সময়ের দিকে দেখতে পাচ্ছি কিন্ত ১৩.৭ আলোকবর্ষ পরে নক্ষত্রপুঞ্জের গতি কমে আসছে কিনা কিংবা ভবিষ্যতের কোন এক সময়ে নক্ষত্রপুঞ্জ আরও ছড়িয়ে পরার মত অবস্থান তৈরী হচ্ছে কিনা সেটা আমাদের পর্যবেক্ষনের বাইরেই থেকে যাচ্ছে কেন। আলোর গতিই

যদি আমাদের এই মহাবিশ্বের সময় পরিমাপের মৌলিক একক হ'য়ে থাকে তবে আমরা আমাদের মহাবিশ্বের আলোকবর্ষের শুধু অতীতই দেখতে পাচ্ছি, ভবিষ্যৎ নয়।

এবারে অদ্ভুত এক বৈপরীত্যের সামনে এসে পরেছি আমরা। মহাজাগতিক আবলোকনের সময় আমরা অতীতে যাচ্ছি, কিছুতেই ভবিষ্যতমূখী হ'তে পারছিনা কিন্তু আবার মহাশুন্যে আলোর গতির কারণে আমরা পৃথিবীর ভবিষ্যতে পৌঁছাবার মত অবস্থান প্রমান করতে পেরেছি কিন্তু অতীতে যাবার বিষয়টি এখনো ধোঁয়াশার মাঝেই আটকে আছে। এই যায়গায় এসে "সমতল মহাবিশ্বের অবস্থান" তত্বটি আমার কাছে অধিক গ্রহণ যোগ্য বলে মনে হয়। আমাদের এই সমগ্র মহাবিশ্বের একটি সমতলের উপর অবস্থান করার কারণে আমরা মহাশুন্যের যেদিকেই তাকাচ্ছি সেদিকেই শুধু অতীত দেখতে পাচ্ছি। যাইহোক, যেভাবে আমাদের প্রযুক্তি এগিয়ে চলেছে সেই ভাবেই যদি এগিয়ে যেতে পারে তবে হয়তো মহাজাগতিক সৃষ্টির জন্ম লগ্নের কাছাকাছি একদিন আমরা পৌঁছাতে পারবো, আর জন্মকে জানলেই হয়তো আমরা ভবিতব্যকেও বুঝতে পারবো। তবে আমার বিশ্বাস, মানব জ্ঞানের ভবিতব্য নির্ধারিত হয়ে আছে বিশ্বাসের কাছে আত্মসমর্পণের মাঝে।

আমরা মানব ইতিহাসের ভবিতব্যের খোঁজে আছি। সুতরাং, শুন্য থেকে সৃষ্ট এই মহাজাগতিক বিস্ময় থেকে আবার আমাদের দৃষ্টি ফিরিয়ে নেই মহাজগতের তুলনায় আরও শুন্য মানব জন্মের দিকে। আগেই বলেছি, ভাল-মন্দ, হ্যা-না ইত্যাদি সবই নির্ভর করে প্রেক্ষাপটের ওপর। যেমন, মানুষের জন্ম ক্যান্সার সেল থেকেই। ক্যান্সার সেল সেটাই যেটা নিজেকে ভেঙ্গে ভেঙ্গে নতুন সেল গঠন করে। মানুষের শুরুও প্রথমে একটি সেল, পরে দু'টি, চারটি এভাবেই বাড়তে বাড়তে একটি পূর্নাঙ্গ মানব দেহ গঠিত হয়, তারপর জন্ম। জন্মের পরও ক্যান্সার প্রক্রিয়া চলতে থাকে, বাড়তে থাকে মানুষের দেহ। তারপর একদিন এই ভাল ক্যান্সার প্রক্রিয়া কমা শুরু করে, মানুষ মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায়। আর আমরা যাকে সাধারণত ক্যান্সার সেল বলে বুঝে থাকি, অর্থাৎ, খারাপ ক্যান্সার কোষ, যে কোষগুলো বাড়তে থাকলে মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নষ্ট হয়ে যায়, সেই ক্যান্সার কোষের সাথে এই কোষের মৌলিক পার্থক্য এটাই, ভাল ক্যান্সার সেলের জন্য মানুষের জন্ম, বৃদ্ধি এবং খারাপ ক্যান্সার সেলের বৃদ্ধির জন্য মানুষের মৃত্যু।

কিন্ত কোন প্রেক্ষাপটে আমরা এই ভাল এবং মন্দ ক্যান্সার কোষ বলে স্বীকৃতি দিচ্ছি?? বেঁচে থাকার প্রেক্ষাপটে। কোন মানুষ যদি জন্মাবার কিছুদিন পরেই তার জন্ম রহস্য এবং এই জগতে তার অবস্থানের কারণ ও করণ খুঁজে পেয়ে সেই অনুযায়ী কর্মসাধন করে ফেলে, তবে তো বিষয়টি উলটে গেল। কারণ, সে তখন চাইবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপাত দৃষ্টির এই ত্রৈমাত্রিক জগতের মায়া ছেড়ে পরবর্তী জগতে পা রাখতে। তখন ভাল ক্যান্সার কোষের কারণে নির্মিত মানুষটার জন্য ভাল কোষ গুলোই হয়ে দাঁড়ায় খারাপ কোষ। তাহলে কি এই বিশ্ব জগতে আসবার কারণ ও করণ খোঁজাটা আমাদের উচিৎ নয় বলবো?
নাহ, এই সিদ্ধান্তেই যদি যেতে চাই তাহলে আর ইউজার ম্যানুয়াল আসতো না আমাদের জন্য।

জীবন ও জীবনশক্তি

শক্তির কতগুলো রূপ থাকতে পারে সেটা নিয়ে বিজ্ঞানে বিতর্ক আছে। স্বীকৃত কিছু রূপ যেমন, আলোক শক্তি, শব্দ শক্তি, তাপ শক্তি, চৌম্বক শক্তি, তড়িৎ শক্তি, রাসায়নিক শক্তি, সৌর শক্তি, পারমানবিক শক্তি ইত্যাদি।

পদার্থের এবং শক্তির রুপান্তর আছে কিন্তু বিনাশ নাই, এই বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় মানুষ খাদ্য হিসেবে গ্রহন করে বিভিন্ন পদার্থ, যার রুপান্তরিত রূপ তার শক্তি। তাহলে মানুষ কোন শক্তিতে জন্ম নিচ্ছে এবং কোন শক্তিতে মানুষের যাপিত জীবন চলছে? একটি শিশু জন্ম নেবার সাথে সাথে তাকে উল্টো করে ঝুলিয়ে পিঠে দুই-তিনটি থাপ্পর দিয়ে যে চক্রের সুত্রপাত, সেই চক্রে স্বীকৃত এবং এখনো মানুষের কাছে গোপন আছে এমন ধরনের সকল শক্তির মিশ্রনই মানুষের এই জীবন শক্তির মৌলিকত্ব। অক্সিজেন দিয়ে এই শক্তির উৎপাদন প্রক্রিয়া শুরু, রক্তের মাধ্যমে সেই শক্তি বাহিত হয়ে ব্রেইন দিয়ে পরিচালিত একটি চক্র। সেই চক্রের বিভিন্ন স্তরে রয়েছে শক্তি উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদান, এমনকি পারমানবিক উপাদানও আছে কিনা সেই প্রশ্ন আসতেই পারে।

আমরা যদি গিটার বা একতারা বা যে কোন তার দিয়ে বাঁধা বাদ্যযন্ত্রের তারের দিকে লক্ষ করি তাহলে দেখা যাবে, দুদিকে বাঁধা থাকলেও ঘুর্নায়মান একটি কম্পন তৈরী হয়েছে। সেক্ষেত্রে পরমানুর ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কণা গুলো তো কোন যায়গায় বাঁধা নেই, সুতরাং, তার কম্পন অবশ্যই ঘুর্নায়মান। আর এই ঘুর্নায়মান কম্পনই (ওয়েভ লেন্থ) তুলছে সূর, একেক ধরনের পদার্থের পরমানুর জন্য একেক রকম সূর, তাল, ছন্দ বলে দিচ্ছে সেই পদার্থের বৈশিষ্ট্য, জানান দিচ্ছে তার অস্তিত্ব।

কথিত আছে, আমাদের সঙ্গীত বিশেষজ্ঞরা একসময় বিভিন্ন রাগে বিভিন্ন কর্ম সাধন করতে পারতেন, মেঘমল্লার রাগে বৃষ্টি নিয়ে আসতেন। বিষয়টিকে আজগুবি বলে উড়িয়ে দেয়া যায় কিন্তু এখানেই বস্তু জগতের কম্পনাঙ্কের বিশেষত্ব লুকিয়ে আছে। বৃষ্টি আনার মত কম্পন তৈরী করার কাজ হয়তো আমাদের তপস্যারত সঙ্গীত শিল্পীরা আজকাল আর করতে পারেন না কিন্তু এটা সত্য যে, বহু অপেরা শিল্পী তাদের গলার কম্পনাঙ্ক সেই মাত্রায় নিয়ে যেতে পারেন যেখানে একটা গ্লাস ভেঙ্গে চৌচিড় হয়ে যেতে পারে। এটা প্রমানীত সত্য যে, বিশাল বিশাল বিল্ডিং বা স্থাপনা ধ্বসে পরতে পারে যদি সেই বিল্ডিং বা স্থাপনার সম্মিলিত কম্পনাঙ্ক খুঁজে বের করে, সেই কম্পনাঙ্কের সমান কম্পন সেই বিল্ডিং বা স্থাপনায় ফেরত পাঠানো যায়।

মানুষের প্রতিটি কোষের ঘুর্নায়মান কম্পনাঙ্ক থেকেও তৈরী হচ্ছে চৌম্বকীয় শক্তি। তবে আমার ধারনা, মানুষের শক্তি উৎপাদনের ভাগ গুলো দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে যাচ্ছে। একভাগ যুক্তির চৌম্বকীয় শক্তি আরেক ভাগ আবেগের। যে কারনে যৌক্তিক কম্পন ও আবেগীয় কম্পনের কম্পনাঙ্ক দুই রকমের। আমাদের বোধের এই ত্রৈমাত্রিক বিশ্বে জীবনের চালিকা শক্তির পাওয়ার সেল গুলোর প্রতিটিকে এক সুরে বাঁধার সংযুক্তির কাজে যারা সফল, তাদের ইহজগতের কর্ম শেষ করে পরবর্তি বিশ্বের জন্য প্রস্তুত বলে ধরে নেয়া যায়। আমাদের বর্তমান আলোচনার জন্য, এই মহাবিশ্বের ভবিতব্য নির্ধারনে এর চেয়ে বেশী কিছু বলাটা অপ্রয়োজনীয়।

সৃষ্টির সবচেয়ে বিস্ময়কর বিষয় বলে মনে হয় মায়ের গর্ভে পানিতে অবস্থানরত অবস্থায় নিজ জীবনীশক্তি নিয়ে বেড়ে উঠতে থাকা শিশুটিকে নিয়ে। প্রথম কোষ থেকেই শিশুটির নিজস্ব কম্পনধারা তৈরী হচ্ছে কিন্তু সেই কম্পনাঙ্ক মায়ের কম্পনাঙ্কের অনুরণিত কম্পন মাত্র। শুধুমাত্র একটি এম্বিক্যাল কর্ডের মাধ্যমে কম্পনাঙ্ক থেকে শুরু করে শিশুটির যাবতীয় কর্মকাণ্ড আসলেই বিস্ময়কর। শিশুটি আমাদের এই তথাকথিত ত্রৈমাত্রিক বিশ্বে এসে অক্সিজেন গ্রহনের সাথে সাথেই শুরু করলো তার নিজস্ব শক্তি সৃষ্টি চক্র বা নিজস্ব কম্পন, তৈরী হল নতুন সত্বা। মানুষের জন্ম হল।

আমরা এস্কেটোলজির খোঁজে শেষ বিচার সম্পর্কিত আলোচনা করতে যেয়ে, যুক্তির ফোর্থ ডাইমেনশনে "সময়" নিয়ে আইনস্টাইনের প্রায় প্রমানিত তত্ব পেয়ে কিছুটা নিশ্চিন্ত হলেও, চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি আবেগের তিনটি স্তর, তথা, প্রেম-ভয়, আমিত্ব-সম্পর্ক, কল্পনা-জিজ্ঞাসা পেরিয়ে, "যুক্তি"র "সময়" মাত্রা এবং "আবেগ"এর "সময়" স্তর কে এক যায়গায় আনবার লক্ষ্যে। সমস্যা দাঁড়িয়েছে "সময়"এর অবস্থান নিয়ে। অবশ্যই "সময়" একটি মাত্রা যার উপস্থিতি "যৌক্তিক" মাত্রা এবং "আবেগীয়" স্তর উভয় ক্ষেত্রেই প্রমানীত এবং আমরা আবশ্যই ত্রৈমাত্রিক নয় চতুর্মাত্রিক জগতে বসবাস করছি। এটাও প্রমানীত যে, আমাদের "যৌক্তিক" মাত্রা গুলোও শুন্য এবং "আবেগীয়" স্তর গুলোও সর্বগ্রাহ্য প্রমাণিত নয়। তারপরও তাদের অস্তিত্ব স্বীকৃত শুধুমাত্র আমাদের ব্রেইনের কর্মকাণ্ডের ফলে। সেক্ষেত্রে "সময়" নামক মাত্রাটির অস্তিত্ব প্রমানীত অথচ শুধুমাত্র "সময়" নামক চতুর্থ মাত্রাটির ব্যাখ্যার জটিলতায় আমাদের ইহজাগতিক "যৌক্তিক" মাত্রা ও "আবেগীয়" স্তরের মোট আটটি মাত্রার মহাসম্মিলনের কার্য সম্পাদন করতে পারছিনা।

স্রষ্টার সৃষ্টির সকল বস্তু বা প্রানী জগতের এটমের নিজস্ব কম্পনাঙ্কের একটা ঐক্য রয়েছে এবং সেই ঐক্যকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা রঙ এবং সূরকে একটি ঐক্যতানে বেঁধে একটি সূর ঝংকার সৃষ্টি করার লক্ষে এস্কেটোলজি নামের দর্শন আমাদেরকে আমাদের সীমিত বোধের ত্রিমাত্রিক জগৎ থেকে নিয়ে যাবে সেই স্তরে, যে স্তর থেকে আমরা অনুভব করতে পারবো সৃষ্টির রঙ ও সূর ঝংকারকে।

<u>আত্মার এবং মানবতার ভবিতব্য</u>

বাংলা ভাষায় আত্মা, পরমাত্মা শব্দগুলোর বিভিন্ন প্রয়োগ থাকায় (যেমন, ভুত-প্রেত নিয়ে কথা বললেও আত্মা, পরমাত্মা শব্দগুলো ব্যবহার করা হয়) শব্দগুলো সম্পর্কে উপলব্ধিগত ভ্রান্ত ধারনা আমাদের মাঝে কাজ করে থাকে। এখানে আত্মা বলতে মানুষের "রুহ" বা জীবন শক্তির কথাই বলতে চাইছি। এস্কেটোলজি মহা বিশ্বের শেষ নিয়ে আলোচনা হলেও, মূলত মানুষের আত্মার, মানবতার ভবিতব্য নিয়ে কথা বলে এবং স্বাভাবিক ভাবেই উপরোক্ত দু'টো বিষয়ের মূলে পৌঁছাতে পারলে শেষ বিচারেরও মূলে পৌঁছানো যাবে।

আগে আমরা একটু শারিরিক জগতে ঘুরে আসি। এস্কেটোলজিও ভাবনায় শরীরের ভুমিকা খুবই সামান্য হলেও এই শরীরই যেহেতু আমাদের এই জগতের মূল বাহন, অতএব, শরীরের একট গুরুত্বপুর্ন ভূমিকা এস্কেটোলজিতে থাকবে এটাই স্বাভাবিক। আমরা যে "যৌক্তিক" মাত্রা এবং "আবেগীয়" স্তর নিয়ে কথা বলছি, সেই দুটি বিষয়ই এই শরীর কেন্দ্রীক।

আমাদের শরীরের প্রায় ৭০% পানি এবং মাত্র ত্রিশ ভাগ গঠিত শক্ত কোন বস্তু দিয়ে। ধর্মীয় দৃষ্টি কোন থেকে মাটি ও পানির সংমিশ্রনে তৈরী কাঁদা দিয়ে শরীর তৈরী হয়েছে। আবার আমরা এটাও বুঝতে পারছি যে, শরীরের মূল চালিকা শক্তি সমুহ বা বিদ্যুত উৎপাদন কেন্দ্রগুলোর মৌলিক উপাদানের একটি হল অক্সিজেন। সেই অক্সিজেন ব্যবহার করে এবং বিভিন্ন কম্পনের মাধ্যমে তৈরী চৌম্বকীয় শক্তি এবং হয়তো আরও কিছু অজ্ঞাত শক্তির সমষ্টিই হচ্ছে জীবন শক্তি। তাহলে একটি বিষয় নিশ্চিত করে বলা যায় যে, আমাদের শরীরে কঠিন, তরল ও বায়বীয় বস্তু একই সাথে অবস্থান করছে।

এটাও প্রমানীত সত্য যে, পানিকে যে পরিবেশে রাখা হবে সেই পরিবেশ অনুযায়ী পানির কৃষ্টাল বা স্ফটিক কণাও পরিবর্তিত হবে। অর্থাৎ, যদি আমরা একটি পানির গ্লাসকে কোলাহলের মাঝে রাখি তবে

তার স্ফটিক হবে একরকম, তেমনি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত বা ব্যান্ড সঙ্গীত বা ধর্মীও পরিবেশে রাখার কারনে একই পানির স্ফটিক একেক রূপ ধারন করবে।

সবচেয়ে মজার বিষয় হল, আমরা যা খাচ্ছি তার সব কিছুতেই পানির পরিমান অনেক। সুতরাং, খাদ্যের পরিবেশগত সংরক্ষনের কারণে আমাদের শারিরিক ও মানসিক গুনগত পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং, এটাও নিশ্চিত ভাবে ধরে নেয়া যায় যে, আমাদের চারপাশের বাতাস কোন পরিবেশে সংরক্ষিত আছে তার উপর আমাদের শরীরের উৎপাদিত শক্তির গুনগত মান নির্ভর করবে। অতএব, আমরা খাবার হিসেবে যে কঠিন, তরল ও বায়বীয় বাতাস গ্রহন করছি, এই তিনটি বস্তুরই সংরক্ষন পরিবেশের উপর নির্ভর করবে আমাদের আত্মিক গুনগত মান।

তাহলে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি, আত্মিক জগতের দুইটি ভাগ "যৌক্তিক" এবং "আবেগীয়" এর স্বাধীন ইচ্ছা শক্তি আছে কিন্তু সেই স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি আবদ্ধ আছে মাটি ও পানি দিয়ে নির্মিত একটি ভৌত অবকাঠামো "শরীর" এর মাঝে এবং সেই শরীরকে পরিচালিত করতে যে শক্তির প্রয়োজন, সেই শক্তি উৎপাদনের জন্য আমাদের দেহের ভেতরে কিছু কেন্দ্র আছে। আত্মিক জগতের দুইটি ভাগ এবং জীবন শক্তি উৎপাদনের বিভিন্ন কেন্দ্রের এবং শরীরের কোষ সমুহের কম্পনাঙ্ক কে এক সূরে বাঁধার মাধ্যমে চতুর্থ ডাইমেনশন “সময়” কে জয় ক’রে, ইহজাগতিক মোক্ষ সাধনই এস্কেটোলজি ভাবনার মৌলিক অভিপ্রায়, আর এই কাজে ইউজার ম্যানুয়াল এস্কেটোলজি ভাবনার পাথেয়।

প্রতিদিন নতুন সকালে ঘুম থেকে উঠে নতুন সূর্যের সাথে, নতুন দিনের সাথে আলাপন, নতুন জন্ম দিয়েই। এখানেও আমার কিছু প্রশ্ন আছে। ঘুম আর মৃত্যুর পার্থক্য কতটুকু? দেহ যেহেতু বিভিন্ন কোষের যোগফল, তাহলে এই ত্রৈমাত্রিক বিশ্বে মৃত্যু যেমন দেহের কর্মকান্ডের অন্তত আপাত পরিসমাপ্তি ঘোষনা করছে, তাহলে ঘুম কেন করছেনা? নাকি ঘুমের মধ্য দিয়ে যৌক্তিক ও আবেগীয় স্তরের কোন গুনগত পার্থক্য তৈরী করে। যেমন, ঘুম হয়তো “যৌক্তিক” মাত্রা ও “আবেগীয়” স্তরকে কঠিন অবস্থা থেকে তরল বা বায়বীয় করে ফেলে।

আগেই আমরা আলোচনা করেছি যে, মানুষ সহ পৃথিবীর সকল বস্তু একই ধরনের স্ট্রাকচার সম্পন্ন মৌলিক কনিকা বা এটম দিয়ে গঠিত। এস্কেটোলজি যেহেতু শেষ বিচার নিয়েই কথা বলে, সুতরাং, মহাবিশ্বের শেষ বিচারে সৃষ্টির সকল কিছুকেই কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে বলেই ধরে নেয়া যায়। সেইক্ষেত্রে ‘মোক্ষ” শব্দটিকে আমরা মানুষের বর্তমান জগতের মোক্ষ বা চুড়ান্ত লক্ষ হিসেবে দেখবো।

ফ্রি উইল

এস্কেটোলজির ভাবনার যত গভীরে আমি যাবার চেষ্টা করেছি ততই আমার মনে হয়েছে, এই মহাবিশ্বে মানুষের ফ্রি উইল বা মুক্ত চিন্তা তথা স্বাধীন ইচ্ছা অসীম কোন বিষয় নয়। অবশ্য একটা সমাধানে আসা যায়। যেমন, কোয়ান্টাম মেকানিক্স প্রমান করেছে, কোন একজনের পর্যবেক্ষণের পরিপ্রেক্ষিতে সব কিছু বিবেচনা করা হয়। সুতরাং, যার পর্যবেক্ষনেই বৈশ্বিক জগতের ঘটমান ঘটনাবলী ঘটে চলেছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের “স্তর” ও “মাত্রা”য় ফ্রি উইল কার্যকর আছে বলে ধরে নেয়া যায়।

কিন্তু আগেই আমরা দেখেছি যে, ব্রেইনের আরেকটি দিক, আবেগকে বোঝাবার জন্যই ব্রেইনের যৌক্তিকতার অবতারনা। তারমানে আমার নিজের কাছেই দু’টি দিক আছে এবং আমার নিজেকেই যুক্তি

দিয়ে নিজেকে বোঝাতে হচ্ছে কেন এটা ভাল এবং কেন এটা মন্দ। তাহলে আমার নিজের এই দুই সত্বার মাঝে সমন্বয় সত্বা মিলে তৃতীয় আরেকটি সত্বা স্বাধীন চিন্তার প্রেক্ষাপট তৈরী করছে, যে সত্বাকে আমরা বলছি "চৈতন্য"। কিন্তু সমস্যা একটা থেকেই যাচ্ছে, এখানে পর্যবেক্ষক হিসেবে একজন থাকতে হবেই। সেই পর্যবেক্ষকটা কে? এবং সেই পর্যবেক্ষকের পর্যবেক্ষনের তুলনায় আমার ফ্রি উইল কতটুকু গ্রহণযোগ্য।

একই ভাবে "আবেগ"এর তৃতীয় স্তরকে যদি আমরা "যুক্তি"র তৃতীয় স্তরের প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড় করাই, যাকে ব্রেইনের যুক্তির তৃতীয় স্তর যুক্তি দিয়ে বোঝচ্ছে কোনটা সঠিক, সেই আবেগের তৃতীয় স্তরেও কিন্তু আমরা স্বপ্নের গল্পে দেখেছি, সেখানে স্বাধীন চিন্তা ব্রেইনের যুক্তির তৃতীয় স্তরের সাথে ঐক্য গড়ে, কল্পনা ও প্রশ্নের মাধ্যমে কাজ করে চলেছে। এই তৃতীয় স্তরের ক্ষমতা সম্পর্কে স্বপ্নের ব্যাখ্যার মাধ্যমে আমি যতটুকু বুঝি, কল্পনায় অসীম শক্তি সম্পন্ন কিন্তু সীমাবদ্ধ কল্পনা শক্তি। যে কারনে স্বপ্ন দেখার সময় স্থানিক সূচক গুলো পরিবর্তিত হয়ে যায় এবং একজনের বেশী পরিচিত চরিত্রকে সে যায়গা দিতে পারছে না। তারপরও তো সে মুক্ত স্বাধীন চিন্তা করার ক্ষমতা রাখে। তাহলে, সীমিত আকারে হলেও মানুষের ফ্রি উইল আছে, তবে সেটা পর্যবেক্ষকের পর্যবেক্ষনের পরিপ্রেক্ষিতে।

ফ্রি উইলের সীমাবদ্ধতাটুকুকে মেনে নিয়েই বলা যায়, সৃষ্টির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কোন সিদ্ধান্তে কি হতে পারতো অথবা ফ্রি উইলের সিদ্ধান্তের কারনে কি ঘটেছে, সেটা একটি টাইম টানেলে ধারনকৃত অবস্থায় আছে। এটা শুধু এস্কেটোলজিক বিশ্বাস নয়, প্রায় প্রমানীত একটি বৈজ্ঞানিক বিশ্বাস। সেক্ষেত্রে এই মহাবিশ্বে আমাদের মোক্ষ শুধু একটাই হওয়া সম্ভব বলে আমি বিশ্বাস করি, আর সেটা হল, "সময়" নামের মাত্রা ও স্তরকে খুঁজে বের করে অনন্ত মহাবিশ্বে উপনীত হওয়া। সেই মহাবিশ্বে আমাদের জন্য যেমন 'যৌক্তিক" মাত্রা ও 'আবেগীয়" স্তর গুলোর প্রয়োজন নেই, ঠিক তেমনি "সময়" নামক মাত্রাটিও কোন ফ্যাক্টর হয়ে থাকবে না। যে কোন দুঃখ-সুখ-বেদনার হিসেব অনন্ত কালে উপনীত হবে। এটাকেই আমরা বলতে পারি আত্মার ভবিতব্য।

তাহলে "সময়" কে কি ভাবে খুঁজে পাওয়া যাবে? এখানেই এসে যায় মাটি ও পানি দিয়ে গড়া আমাদের নশ্বর দেহের কথা। "যৌক্তিক" মাত্রায় কিংবা "আবেগীয়" স্তরে ব্যবহৃত "সময়" মাত্রাটির কাজ কারবার অবশ্যই শুধু নশ্বর দেহের শেষ বিচারের জন্য প্রয়োজনীয় নয়, অবিনশ্বর শক্তির আধার আত্মার শেষ বিচার বা ভবিতব্যের জন্যও প্রয়োজনীয়। কিন্তু বর্তমান মহাবিশ্বের প্রয়োজনীয়তা শেষে পরবর্তি মহাবিশ্বে যেহেতু "সময়" সহ "যৌক্তিক" মাত্রা, আবেগীয়" স্তর নামের ডাইমেনশন গুলো মৌলিক মাত্রা হিসেবে তাদের কার্যকরিতা হারাবে, সুতরাং, আমাদের মূল প্রয়োজন এখন "আত্মা", কারন এই শক্তিটিই আমাদের পরবর্তি মহাবিশ্বে একমাত্র প্রয়োজনীয় বিষয়।

আত্মা নামক শক্তি নিয়ে আলোচনা আমার খুব একটা পছন্দের বিষয় নয়। কারণ, বিষয়টি আমার ভাবনায় কুয়াশাচ্ছন্ন অবস্থায় আছে। আমার ধর্মীয় বিশ্বাস থেকে জানি, জ্বিন নামক আরেকটি জাতি আমাদের এই মহাবিশ্বে আছে যারা আগুন দিয়ে তৈরী, আর মানুষ তৈরী মাটি ও পানি থেকে। কিন্তু এটাও ঠিক যে মানুষের মৌলিক শক্তি "নূর" বা আলো দিয়ে তৈরী। সেক্ষেত্রে আগুন আর নূরের মাঝের পার্থক্যটি মোটা দাগে বলা যায়, আগুন নিজে একা জ্বলে উঠবার ক্ষমতা রাখে না কিন্তু জ্বলে উঠবার পরে বিভিন্ন ভাবেই সে আলো সহ বিভিন্ন শক্তি উৎপাদন করতে পারে। অপর দিকে আলো নিজেই একটি শক্তি এবং ভাল লাগার বিষয় একটি, এই আলোর গতি দিয়েই সীমাবদ্ধ রয়েছে আমাদের বর্তমান অবস্থান এই মহাবিশ্ব। তবে আমাকে কনফিউজ করে দেয়ার মত সমস্যা তৈরী হয় তখন, যখন আগুন জ্বলে উঠবার পর একটি বিষয় তৈরী হয়, সেটা হল "আলো"। এখন মানবিক আত্মার আলো আর

স্বিনের আগুনের আলো যদি একই কাতারে ফেলে দেয়া হয়, তাহলে এই মহাবিশ্বের ভবিতব্যের পর পরবর্তি মহবিশ্বে এই দুইটি বিষয়, আগুন ও আলো একই যায়গায় কিভাবে অবস্থান করতে পারে। আমার ইউজার ম্যানুয়ালে অবশ্যই সৃষ্টি এবং সৃষ্টির লয় সম্পর্কিত সব কিছু সম্পর্কেই আলোকপাত করেছে। কিন্তু আগুন বলতে আমরা কেন সবসময়ই মনে করবো অক্সিজেন জনিত আগুন?

আলো, আলোর গতি সম্পর্কিত বিজ্ঞান এখন পর্যন্ত যা আলোচনা করে, তার সবই মহাশুন্যে আলোর পর্যবেক্ষিত অবস্থান নিয়ে। আর আরেকটি ইকুয়েশন তো আমাদের সকলেরই জানা আছে, e=MCস্কোয়ার। আমরা যদি আমাদের সবচেয়ে পরিচিত আগ্নেয় নক্ষত্র সূর্যের কাছে চলে যাই তবেই আমরা দেখতে পাবো, ওখানে আগুন জ্বলছে এই ইকুয়েশনের ভিত্তিতেই, অক্সিজেন ছাড়া এটমিক ফিউশনের মধ্য দিয়ে। সুতরাং, আগুন বলতে এটমিক ফিউশন বা অন্য ধরনের কিছুর কথা যে বলা হয়নি সেটার বিষয়ে আমি অন্তত নিশ্চিত নই। তবে আমি নিশ্চিত, আগুন আগে তৈরী হয়েছে এবং আলো পরবর্তিতে এসেছে। এবং এটাও আমি নিশ্চিত যে, আমরা, অর্থাৎ, মানুষ যে শক্তি বা আত্মার বলে পরিচালিত তার গতি ও পরিশুদ্ধতা আগুনের চেয়ে অনেক বেশী এবং এস্কেটোলজিতে মানবিক ‘আলো”র অগ্রাধিকার থাকবেই।

এস্কেটোলজির মূল বিষয় আত্মার এবং মানবতার ভবিতব্য বলতে আমি কি বলতে চাইছি। আমার আগের একটি লেখার কিছু অংশ টেনে এনে বিষয়টি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করি।

> ***একজন জাহাজের ক্যাপ্টেন তার সমুদ্র যাত্রার শুরুতে তার যাত্রা পথ নির্ধারন করে জাহাজের ভবিষ্যত কোর্স বা গতিপথ নির্ধারন করেন। কাজটি খুব সহজ মনে হবে। চার্ট বা জাহাজী ম্যাপের এক বিন্দু থেকে আরেক বিন্দু পর্যন্ত লাইন টেনে কোর্সের ডিগ্রী বের করলেই তো হল। কথাটা ঠিক তবে অত সহজ নয়। প্রথমেই তাকে সংগ্রহ করতে হয় যাত্রাপথের আবহাওয়া সম্পর্কিত ভবিষ্যৎ বাণী সমুহ (বা ভ্যারিয়েবল, যা অবশ্যই পরিবর্তিত হতে পারে)। তারপর বাতাসের গতি – প্রকৃতি, তারপর আছে সমুদ্রের স্রোতের গতি প্রকৃতি ইত্যাদি। সবকিছু গননায় নিয়ে তিনি কোর্স তো ঠিক করলেন, তারপরও প্রতিদিন সূর্যের সাথে, তারকা সমুহ এবং চার্টে দেয়া বিভিন্ন নির্দিষ্ট স্থাপনার সাথে জাহাজের অবস্থান মিলিয়ে দায়ীত্বে নিয়োজিত অফিসারেরা জাহাজের কোর্স এডজাস্ট করেন। জাহাজের ক্যাপ্টেন শুধু মাঝে মাঝে নিশ্চিত করেন যে, তার নির্ধারিত মূল কোর্সে জাহাজটি রয়েছে কিনা।***
>
> ***এবার ওপরের বিষয়টি বিশ্লেষণ করা যাক "গন্তব্য, শেষ গন্তব্য এবং ভবিতব্য" এর ছাঁচে ফেলে। এখানে গন্তব্যে পৌঁছে জাহাজটি কি করবে সেটা হল ভবিতব্য, জাহজটি এক বিন্দু থেকে আরেক বিন্দুতে যাবে– সেটা হল গন্তব্য, নির্দিষ্ট বন্দরে পৌঁছানোর লক্ষই হচ্ছে শেষ গন্তব্য। আর "বর্তমান" ও বাস্তব" শব্দগূলো বাতাস, স্রোত, আবহাওয়া সহ বিভিন্ন কারনে পরিবর্তিত হয়ে চলেছে এবং চলমান ইতিহাসের নায়ক, খলনায়কেরা অবধারিত এবং নির্ধারিত ভাবেই চুড়ান্ত সত্যে পৌঁছাবার লক্ষে বর্তমান ইতিহাসের ভেরিয়েবল গুলো মাথায় নিয়ে চলমান ইতিহাসের কোর্স এডজাস্ট করে চলেছেন।***

আগেই বলেছি, অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত, সব কালই সময়ের একই টাইম টানেলে আবদ্ধ। এই কাল তিনটির পার্থক্য গড়ে দিচ্ছে আমাদের ব্রেইন। যেখানে, স্মৃতির ভান্ডারে জমে থাকা কিছু অভিজ্ঞতা আমাকে বলে দিচ্ছে ওটা অতীত। আর বর্তমানকাল প্রতি মুহূর্তে সেই ভান্ডারের যোগানদার হিসেবে কাজ করে চলেছে এবং ভবিষ্যতকালটি ব্যাখ্যার অভাবে আমাদের কাছে রহস্যময় থেকে যাচ্ছে কিন্তু মানব জ্ঞানের প্রতিটি পদক্ষেপ সেই রহস্যের সমাধানে এগিয়ে চলেছে। আরেকটি বিষয়ও নিশ্চিত ভাবে আমি বিশ্বাস করি, একই সময়ে কমপক্ষে দু’টি টাইম টানেল কাজ করে চলেছে। অর্থাৎ, আমরা আমাদের বর্তমান যে টাইম টানেলে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নিচ্ছি, তার বিপরীতে সিদ্ধান্তটি অন্য রকম নিলে কি হবে বা

হতে পারে, সেটাও আরেকটি টাইম টানেলে রয়েছে। অতএব, পর্যবেক্ষকের জন্য তুলনামূলক বিচার কোন বিষয়ই না। আমাদের দায়ীত্ব সীমাবদ্ধ শুধু "হ্যা" এবং "না", "নিষিদ্ধতা" ও "অবশ্য পালনীয়" গন্ডির মাঝে। সৃষ্টি কর্তার সৃষ্ট নীতিমালার বাইরে যেয়ে কোন কর্ম সাধনে কেউ সৃষ্টির ভারসাম্যে প্রলয়ংকরী অনাসৃষ্টি ডেকে না আনার নির্দেশনাই নিষিদ্ধতার সীমারেখা।

ধরা নেয়া যাক একটি গাছের পাতার গল্প। পাতাটি কোন একসময় মনে করলো সৃষ্টির এই ট্রিলিয়ন কোটি পাতার মাঝে তার প্রয়োজনীয়তা নাই। আমরা যদিও সিদ্ধান্ত নিয়েছি এই মহাবিশ্ব শুন্যতা দিয়ে তৈরী, তারপরও সেই শুন্যের অসীমতায় নিজেকে নগন্য মনে করে সে যদি ইচ্ছাকৃত ভাবে ছিটকে পরে, সেই ছিটকে পরার কারনে সৃষ্টিচক্রে তার অক্সিজেন দেবার অবদানে যেটুকু ঘাটতি পরলো তার দায়ীত্ব কে নেবে। এবং তার লয়ে যত ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র অসামঞ্জস্যই সে এনে থাকুক, মহাবিশ্বের ভারসাম্য তো কিছুটা হলেও সে নষ্ট করলো।

এতো গেলো একটা পাতার গল্প। কিন্ত এস্কেটোলজি নিয়ে ভাবনার সুত্রপাতই তো মানব সৃষ্টির ভবিতব্য নিয়ে কথা বলা। তাহলে এই যে আট বিলিয়ন মানুষ বর্তমানে পৃথিবীতে চলাফেরা করছে, তাদের সকলের কি মানব ইতিহাসের পাতায় তার নিজস্ব পদচিহ্ন রাখার কোন সুযোগ রয়েছে? এতো মানুষের ভিড়ে কি একজনও অপ্রয়োজনীয় মানুষ নেই? কিংবা, এস্কেটোলজি ভাবনার মূল কথাই তো, সৃষ্টির পুর্বেই সৃষ্টির ভবিতব্য নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছে। তাহলে আমাদের বর্তমান কর্মের মূল্য কি? কিংবা, আমরা তো বলছিই কমপক্ষে দুইটি টাইম টানেলে মানব ইতিহাস পথ বেয়ে চলছে, তাহলে কি কারণে মানব ইতিহাসের একই পরিনতি হতে পারে?

এসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজার আগে আমরা আগে খুঁজে বের করার চেষ্টা করি কতগুলো টাইম টানেল থাকার সম্ভবনা আছে। সাধারন দৃষ্টিতে একেকটি বিষয়ে টাইম টানেল থাকার কথা তিনটি। কোন একটি সিদ্ধান্তের তিনটি রাস্তা থাকার কথা।

১) হ্যা।

২) না।

৩) কোন সিদ্ধান্ত না নিয়ে চুপচাপ বসে থাকা।

আমি আবারও বলি, সাধারন দৃষ্টিতে। আরও হয়তো হাজারো টাইম টানেল থাকতে পারে। বিশেষত, মহাবিশ্বের জন্মের আদী থেকে মহাবিশ্বের লয় পর্যন্ত প্রতিটি মানুষের প্রতিটি সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষণটিতে কমপক্ষে তিনটি টাইম-টানেল তৈরী হয়ে চলেছে। আর যেহেতু শেষ বিচার আমাদের বর্তমান আলোচনার মূল বিষয়, সুতরাং শেষ বিচার বলতে মহাজাগতিক সকল কিছুরই শেষ বিচার। অতএব, আমার কাছ থেকে এক ইঞ্চি দূরে অবস্থিত একটি ধুলিকনার জন্যও একটি টাইম-টানেল থাকতেই পারে, কারণ, সেই ধুলিকণাও আমার মতই শুন্যই এবং ইহজাগতিক মহাযজ্ঞের আয়োজনে "আমি"র জন্যই তার সৃষ্টি। সবগুলো টাইম-টানেলের বহমান ঐক্য এক যায়গায় এসে মিলবেই এবং সেই মিলনের সময়টিই আমাদের মহাবিশ্বের ভবিতব্য। অত গভীরে না যেয়ে সাধারন দৃষ্টিকোন থেকেই যদি বিচার করি, তাহলেও মানুষের ফ্রি উইলের সীমান্ত তিনটি সীমা রেখায় ভাগ করে দেয়া হয়েছে এবং এই সীমা মেনে নিয়ে এটাও বলা যায়, ফ্রি উইলের তিনটি সীমা মেনে নিয়ে যে সিদ্ধান্তই নেয়া হোক না কেন, মানব ইতিহাসের ভবিতব্যে কোন পরিবর্তন আসবে না।

এখানে আমি আমার লেখা "স্যাটারডে ক্লাব সিলেটে" এর গল্পের উদাহরণ টেনে আনতে পারি। গল্পটির ভবিতব্য অন্তত তিন ভাবে শেষ করা সম্ভব।

১) মূল গল্পে "মুক্তি" নামের ছেলেটি মারা গিয়েছে।
২) মুক্তি নয়, লেখক নিজেই মারা গেলেন। তাহলেও গল্পটি একই ভাবে শেষ হত এবং লেখকের মৃত্যুর শেষের মত ডায়েরীটি থেকে যেতো মুক্তির হাতে।
৩) কিংবা, তৃতীয় যেভাবে গল্পটি শেষ হতে পারতো, লেখক আলাদা যাবার সিদ্ধান্ত না নিয়ে ক্লাবের সকলের সাথে একই প্লেনে যেতে পারতো এবং প্ল্যান ক্র্যাশে সকলে মারা যেতো এবং লেখকের মৃত্যুর শেষের মত ডায়েরীটি থেকে যেতো মুক্তির হাতে। মৃত্যুর দৃশ্যপট বদলে যেতো এবং গল্পটি একই ভাবে শেষ হত। শুধু মুক্তির সাথে সাধু বাবার দেখা হওয়ার জন্য ছোট্ট একটি প্রেক্ষাপট বা টাইম-টানেল যোগ হত।

<u>"আমি", কর্ম ও মোক্ষ</u>

এস্কেটোলজির মত একটি বিষয়ে আলোচনা করে যত ভাবেই ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হোক না কেন, বিষয়টি আরও দুর্বোদ্ধ হয়ে পরবে। ঠিক যেমন অতিরিক্ত আলো আমাদের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। যে কারণে আমরা রাতের আকাশের সুন্দর নক্ষত্র গুলোকে দিনের সুর্যের প্রখর আলোয় হারিয়ে ফেলি। কিন্তু তারমানে এই নয় যে এস্কেটোলজি অপ্রয়োজনীয়। কেউ যদি ভাবেন যে বাতাসের বাধাটুকু না থাকলে প্লেনের গতি আরও অনেক বেশী হতে পারতো, তারা আসলে ভুলেই যান যে, প্রাথমিক ভাবে প্লেনটি উড়বার সক্ষমতাটুকু পেয়েইছে বাতাসের বাধার কারণেই।

টাইম টানেলে আবদ্ধ সৃষ্টির মহাশুন্যতার মাঝেও ইতিহাসের কিছু সন্ধিক্ষণ আছে বলে আমার মনে হয়, যেখানে এসে সৃষ্টিকর্তা কর্তৃক নির্ধারিত সিদ্ধান্ত একটাই দেয়া থাকে, যেখানে এসে সৃষ্টির দ্বারা সংগঠিত ভুল কর্ম গুলোর কারণে এই মহাবিশ্বে সৃষ্ট অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা সমুহের সমন্বয় সাধন করেন সৃষ্টিকর্তা। ধর্মীও উদাহরণের কাছেই এই কথার সবচেয়ে বড় সত্যতা পাওয়া যাবে। আর সব সবকিছুই গুরুত্বহীন।

ইতিহাসের সন্ধিক্ষণের কয়েকটি ঘটনাবলীকে তুলে ধরা যাক।
১) হিটলার যদি যুদ্ধে জয়ী হত।
২) আলাউদ্দিন খিলজি যদি পরাজিত হত।
৩) আলেক্সেন্ডার যদি এতো অল্প বয়সে মারা না যেতেন।

এসবই ইতিহাসের পাতায় শোভাবর্ধনকারী কিছু নাম ও ঘটনা, যা শুধুমাত্র আমাদের টাইম-টানেলের সেই কালের জন্যই প্রযোজ্য। এখানে অন্য রকম কিছু ঘটলে মানব ইতিহাসের চুড়ান্ত ভবিতব্যে কি এমন ঘটতো। কিছুই না। ফেরাউন থেকে শুরু করে কত শক্তিশালী শক্তি মাত্র কয়েক হাজার বা কয়েকশো বছর পরে এসে মানব সভ্যতার পরিনতিতে দূরে থাকুক, বর্তমান টাইম-টানেলেই বা কি ভূমিকা রাখতে পেরেছে। খুব সহজ ভাবে বোঝার জন্য শুধু হিটলারের কথাই ধরা যাক। অষ্ট্রো-হাঙ্গেরীর প্রিন্স ফার্দিনান্দের ড্রাইভার যদি দৈবক্রমে ভুল রাস্তায় গাড়ি না নিয়ে যেত তবে প্রিন্সের আততায়ীর সামনে পড়বারও কোন কারণ থাকতো না, প্রথম বিশ্বযুদ্ধও হয় তো ঐসময়ে শুরু হ'তো না, আর প্রথম বিশ্বযুদ্ধ না হলে হিটলারও সৃষ্টি হ'তো না এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধও হয় তো হ'তো না। যদি এই

ঘটনাগুলোর এবং মানুষ গুলোর মানব ভবিতব্য নির্ধারনে কোন ভূমিকা রাখার কারণ থেকে থাকে তবে হয়তো এর বিপরীতে এমন অন্য কোন কিছু ঘটতো, যে কারণে অবশ্যই এই ধরনের বিপর্যয় নেমে আসতো। নাম বা ঘটনা এখানে মূল বিষয় নয়।

এস্কেটোলজি নিয়ে কথা বলতে গেলে ভবিতব্য শব্দটি গোলমালের মধ্যে ফেলে দেয়। টাইম টানেলেই যদি সব আবদ্ধ থাকে তাহলে আমার বর্তমান কর্মের মূল্য কি হতে পারে। মানব জাতির ভবিতব্যের সাথে সাথে তো আমারও ভবিতব্য টাইম টানেলে লেখা হয়েই আছে। ফ্রি উইল তো এখানে খুব সামান্যই প্রভাব ফেলে। নাহ, এই অনুসিদ্ধান্তটি আমার মনঃপুত নয়, ঠিক নয়। মানবতার ভবিতব্য এবং একটিমাত্র মানুষের ভবিতব্য, দু'টি আলাদা বিষয়। স্রষ্টার প্রতিটি সৃষ্টির উপর নির্ভরশীল এই মহাবিশ্বের শেষ পরিনতি। অন্যদিকে একটি "আমি"র কর্ম সেই "আমি"র শেষ পরিনতির ফল বয়ে আনে। অন্তত এই মহাবিশ্বে প্রতিটি "আমি" কে তার কর্মের পথ পারি দিতে হবে তাকে একাই এবং সেই কর্মের ফলও তার নিজের জন্যই। এই লেখায় এই বিষয়ে বড় পরিসরে আলোচনা সম্ভব নয়। এস্কেটোলজির উপর আমার আগের দু'টি লেখায় এই বিষয়ে কিছু আলোচনা করেছি।

এস্কেটোলজিতে দেহতত্ব আলাদা একটি বিষয় এবং এই বিষয়ে এই লেখাতেই কিছু আলোচনা করেছি। একটি মানুষের দেহ ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন কোষ দিয়ে তৈরী এবং আমরা আগেই বলেছি, যে ভাবেই হোক প্রতিটি কোষ এবং বহু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নিজস্ব পরিচালন ক্ষমতা ও ঘুর্ণনই বলি আর অন্য যে ভাবেই হোক শক্তি উৎপাদন ক্ষমতা আছে। তারপরেও সামগ্রিকতা আনার লক্ষে তাদেরকে একটি ঐক্য সূত্রে বেঁধে দেয়া হয়েছে। সেই ঐক্য সূত্রের কম্পনাঙ্ক খুঁজে বের করার চেষ্টাই এই মহাবিশ্বে আমাদের অবস্থানের "মোক্ষ"।

ঠিক একই ভাবে মানুষও সমাজবদ্ধ ভাবে বাস করে। এবং বিভিন্ন সমাজের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট গড়ে ওঠে হাজারো বছরের পথ পরিক্রমায়, ধর্ম, ভাষা, গায়ের রঙ ইত্যাদি বহু কিছুর সমন্বয়ে। বিভিন্ন সমাজের এই বৈচিত্রতা মেনে নিয়েই, আমরা সমাজের মাঝে বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য সৃষ্টি না ক'রে, সমাজের আইন কে চ্যালেঞ্জ না ক'রে, তার সাথে তাল মিলিয়ে এগিয়ে চলি। কিন্ত আমরা আগেই আলোচনা করেছি, আবেগীয় মাত্রার তৃতীয় স্তরে কল্পনার বিপরীতেই রয়েছে প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসা। এই প্রশ্নের কারণে, যে কোন "আমি", যে কোন টাইম টানেলের যে কোন পর্যায়ে, যে কোন কিছু সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষণের প্রতিটি মুহুর্তের সিদ্ধান্তই মানবতার ভবিতব্যে ভূমিকা রাখবে।

এখানে একটি উদাহরণ দেবার লোভ সংবরন করতে পারলাম না। সেকেন্ডে চব্বিশটী ফ্রেমে আবদ্ধ কিছু স্থির চিত্রের সমন্বয়ে দুই ঘন্টার একটি ভাল মুভি দেখে আসার পর আমরা কি বলতে পারবো ৬০সেকেন্ডx৬০মিনিটx২ঘন্টাx২৪ফ্রেমের=১,৭২,৮০০ ফ্রেমের মাঝে কোন ফ্রেমটি আমার বিশেষ ভাল লেগেছে। আমার পক্ষে অন্তত সম্ভব না।

আত্মার পরিশুদ্ধি ও চৈতন্য

এখন একটা প্রশ্ন মনে ঘুরপাক খেতেই পারে, এইসব প্রশ্নের উত্তর তো সীমিত স্বাধীন চিন্তার প্রেক্ষাপটে কোন এক "আমি"র বর্তমান টাইম-টানেলের জন্যই শুধুমাত্র প্রযোজ্য। উত্তর গুলো পেলে সেই "আমি"র বর্তমান টাইম-টানেলের মানব ইতিহাসের ভবিতব্য কতটুকু উপকৃত হবে বা "আমি"র নিজের ভবিতব্যে কতটুকু ভূমিকা রাখতে পারবে। এই বিষয়ে আমার ভাবনা একটি ক্ষুদ্র গন্ডিতে আবদ্ধ। প্রশ্নগুলো আসলে

আমাদের টাইম-টানেলের নিস্তরঙ্গ অথচ বহমান একটি জলধারার মাঝে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তর ক্ষন্ড মাত্র। কোন "আমি" যদি মনে করে যে, যেহেতু আমার যাপিত জীবনের জন্য এই "প্রশ্ন" গুলোর উত্তর অপ্রয়োজনীয়, তবে অবশ্যই সে একটি নিস্তরঙ্গ জীবন কাটিয়ে দিতে পারবে কিন্তু 'মোক্ষ" সাধনে "আমি"র ভূমিকা হারিয়ে যাবে জলরাশির মাঝে। "আমি"র আত্মা নামক শক্তিটিকে ব্রেইনের "যুক্তি" ও "আবেগ" থেকে মুক্ত করে পরিশুদ্ব "আমি"কে পেতে চাইলে, জীবনের নিস্তরঙ্গ জলরাশিতে অবস্থিত প্রস্তর ক্ষন্ডসম এই প্রশ্ন গুলোর উত্তর এড়িয়ে গিয়ে নিস্তরঙ্গ জীবনের সাধনা কোন উপকারে আসবে না। "আমি"র যাপিত জীবনের প্রশ্নের এই ছোট্ট ছোট্ট প্রস্তর ক্ষন্ড গুলোর উত্তরই "আমি"র আত্মা কে ব্রেইনের প্রভাব মুক্ত পরিশুদ্ধ 'চৈতন্য" উপহার দিতে পারে।

সুতরাং, মানবতার এস্কেটোলজিতে "আমি" এর ভূমিকা নির্ধারনে, টাইম টানেলের যে কোন অবস্থানে যখনই "আমি"র সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষণটি উপস্থিত হবে, তখনই "আমি"কে আগে থামতে হবে, আবেগ আর যুক্তির ঐক্যের সূর-তাল-অনুরননকে ঐক্যবদ্ধ করে প্রশ্ন করতে হবে, কোন সিদ্ধান্তটি এই ক্ষনে, এই টাইম টানেলের জন্য নায়কোচিত সিদ্ধান্ত হবে। ঐ ক্ষণটিতে সঠিক সিদ্ধান্ত নেবার জন্য, ব্রেইন থেকে শুরু করে শরীরের সকল অনু-পরমানুকে পরিবেশগত সংরক্ষন ও চর্চার মাধ্যমে রাখতে পারলে ব্রেইনের দুটি অংশ, "যুক্তি" ও "আবেগ" আমার চৈতন্যের উপর আলাদা কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না। বাকিটুকু "আমি" এর বিষয় নয়, সব শুন্যের খাতায়।

এখন প্রশ্ন আসতে পারে "চর্চা" শব্দটি দিয়ে আমি কি বোঝাতে চাইছি। "চর্চা' একটি পৃথক এবং বিশাল বিষয়। এখানে সেটা নিয়ে পুর্ণাঙ্গ আলোচনা করবো না। একটি ছোট্ট উদাহরণ দিয়ে আমি আমার দায়ীত্ব এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছি। যেমন, ব্রেইনের চর্চা হতে পারে, ব্রেইনের দুই অংশ "যুক্তি" এবং "আবেগ" কে অনুসরণ করা। এই দু'টি অংশ প্রতি মুহুর্তে তাদের গতি পথ পরিবর্তন ক'রে চনলেছে। এই পরর্তন গুলোকে চিহ্নিত করতে পারলে স্বপ্নের জগতের বিভিন্ন প্রশ্ন এবং তার উত্তরের অংশটুকুও "আমি" চিহ্নিত করতে পারবে। তখনই "আমি" তার "চৈতন্য" কে খুঁজে পাবে। আর "চৈতন্য" খুঁজে পেলে "মোক্ষ" সাধনে "আমি" এক ধাপ এগিয়ে যাবে।

উপসংহার

আসলে থিয়োলজি কখনোই কোন কিছুই নিশ্চিত ভাবে বলতে পারে না। তবে এস্কেটোলজি ভাবনা কখনোই কোন গুপ্ত বিদ্যা নয় যে, একটি শব্দ বা একটি বাক্য বা একটি বই না বুঝে বারেবারে জপলেই যাদুর মত কাজ করবে। এই ভাবনা চলমান, এই ভাবনা বিশ্বাসের, এই ভাবনা চর্চার। অতএব, লেখাটির আপাত শেষ টানি কিছুটা অনিশ্চয়তা দিয়েই।

আমাদের পৃথিবী প্রায় ৩৬৫ দিনে একবার সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। সে কারণেই আমাদের পৃথিবীতে কোথায়ও ছয় ঋতু আবার কোথায়ও বা চার ঋতু। পৃথিবীর নিজস্ব ঘুর্ণয়নে তৈরী হচ্ছে দিন-রাত্রি। আর চন্দ্রের প্রায় ত্রিশ দিনে পৃথিবীকে প্রদক্ষিনের কারণে পৃথিবীর বুকে তৈরী হচ্ছে জোয়ার-ভাটা। তথাকথিত (বারেবারে তথাকথিত শব্দটি উচ্চারন করছি, কারণ, আমি বিশ্বাস করি আমরা চতুর্মাত্রিক বিশ্বে বসবাস করছি) সমগ্র ত্রৈমাত্রিক মহাবিশ্ব পরিচালিত হচ্ছে একে অপরের মধ্যাকর্ষন শক্তি ও ঘুর্ণন বা প্রদক্ষিনের ব্যালেন্সড শক্তির মধ্য দিয়ে। পরবর্তি মহাবিশ্বও হয়তো একই নিয়মে পরিচালিত হচ্ছে বা অন্য কোন নিয়ম আছে সেই মাত্রা বিহীন মহাবিশ্বে। কিন্তু আমাদের এই তথাকথিত ত্রৈমাত্রিক মহাবিশ্বে আমাদের সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ২২০ কলোমিটার গতিতে, প্রায় সাড়ে বাইশ কোটি বছরে আমাদের গ্যালেক্সির কেন্দ্রবিন্দুকে

প্রদক্ষিন করে চলেছে। তাহলে এই মহাবিশ্বের জোয়াড় ভাটা বা মহাবিশ্বের ঋতু পরিবর্তন নিয়ে অথবা মানবতার ভবিতব্য নিয়ে আমরা কতটুকুই বা আর আলোচনা করতে পারবো।

সুতরাং, অতি ক্ষুদ্র জ্ঞান থেকেও এটুকু বলা যায়, সৃষ্টির রহস্যের সমাধান পেতে আমাদের জ্ঞান অনুযায়ী যখন যতটুকু যাওয়া সম্ভব পথ চলতে হবে। এগিয়ে যাবার সাথে তাল মিলিয়ে ভবিতব্যের শেষ সীমানা দিগন্ত রেখার মতই হয়তো আরও আরও দূরে সরে যেতে থাকবে, তারপরেও পথ বেয়ে এগিয়ে যেতে হবে। আমাদের যেতে হবে বহুদূর, মানব ইতিহাসের ভবিতব্যের কাছে। আমি মনে করি, স্রষ্ঠার সৃষ্টির যন্ত্রনাদায়ক প্রসব যন্ত্রনার পূর্বেও ছিল পরিপূর্ণ নিস্তব্ধতা ও শুন্যতা এবং ভবিতব্যও নির্ধারিত আছে প্রচণ্ড যন্ত্রনার পর পরিপূর্ণ প্রশান্তিময় নিস্তব্ধতা ও শুন্যতা।

আমার এস্কেটোলজিক ভাবনার দ্বিতীয় পর্বের সমাপ্তি টানবার আগে দুটি কথা বলতে চাই। এই বিষয়ে প্রথম লেখা "গন্তব্য, শেষ গন্তব্য, ভবিতব্য"। ঐ লেখার পর থেকে আমি এস্কেটোলজির উপর তথ্য-উপাত্ত জোগাড় ক'রে একটি চুড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাবার চেষ্টা করেছি এবং চলমান সব ঘটনার বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছি এস্কেটোলজি দিয়ে। “বিশ্বব্রহ্মান্ড" লেখা শুরু করার আগেই আমার ধারণা জন্মেছিল যে, এতো তথ্য-উপাত্ত আমার ভাবনায় জটিলতা সৃষ্টি করবেই। সেকারণে প্রথম থেকেই লেখাটি আমি কেন লিখছি এবং আমি কোথায় পৌঁছাতে চাইছি সেটা আগে ঠিক করার চেষ্টা করেছি।

আমার লেখার উদ্দেশ্য ছিল, লেখতে লেখতে কোন কারনে শর্টকাটে ভবিতব্যে পৌঁছানোর পথ খুঁজে বের করা। মানুষের শক্তি কেন্দ্র গুলোর মাঝে যদি একটি ঐক্য গড়ে তোলা যায়, তাহলে কি আমরা শর্টকাট রাস্তাটি খুঁজে পেয়ে যাবো কিনা। এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত, ফলো দা ইউজার ম্যানুয়াল।

তবে, লেখা শুরু করার পর আমার লক্ষ পরিবর্তিত হ'য়ে নতুন মোড় নেয়ায়, কিছু যায়গায় শেষ পর্যন্ত সত্যিই ভাবনাজট তৈরি হয়েছে। বিষয়টি আর কিছু নয়, আমার মনে হয়েছে আমরা ত্রিমাত্রিক নয় চতুর্মাত্রিক মহাবিশ্বে আছি, যেখানে "সময়" নামের আরও একটি মাত্রা কাজ করছে কিন্তু আমাদের ব্রেইন এই মাত্রাটিকে বুঝতে ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত ভাবে বাধার সৃষ্টি করছে। অনিচ্ছাকৃত বলার কারণ একটাই, "সময়" নামের মাত্রাটি এই মহাবিশ্বে কোন একটি বস্তুর অবস্থানজনিত প্রেক্ষাপটে মহাশুন্যে আলোর গতির উপর নির্ভরশীল এবং মহাশুন্যে আলোর গতি বুঝবার প্রচেষ্টার মাত্র প্রথম সোপানে আমাদের বর্তমান জ্ঞানের অবস্থান।

আমি তথ্য-উপাত্তের মাধ্যমে যেটুকু বুঝতে পেরেছি, স্রষ্টার সৃষ্টির তুলনায় শুধু নয়, মহাবিশ্বে আমাদের সত্যিকারের অবস্থান শুন্য। সুতরাং, শুন্য কোন কিছুর কোন ক্ষমতাই নাই তার শুন্যতার ভবিতব্য নির্ধারনী চিন্তা ভাবনার শেষ সোপানে পৌঁছাবার।

শেষ কথা, সম্পুর্ন ডিভোশন না থাকলে এই ধরনের একটি বিষয়ে লাইনচ্যুত হওয়া খুব সহজ। সম্পুর্ন ডিভোশনে আমার আপত্তি নেই কিন্তু আমার মনে হয়েছে, এই বয়সে এসে, এই ধরনের বিষয় নিয়ে নাড়াচাড়া ক'রে একটিই অর্জন সম্ভব, একজন পাঠকেরও যদি ভাবনার দূয়ার খুলে দেয়া যায়।
ধন্যবাদ।